খ্রিস্টানদের প্রশ্ন মুসলমানদের উত্তর

মুফতি যুবায়ের আহমদ
পরিচালক : ইসলামী দাওয়াহ্ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪
www. jubaerahmad.com
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯৭৮ ১২৭ ৮০, ০১৭৯৮ ৪১৮ ১০০

দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী-২০১৬ইং
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট-২০১৫ ইং

খ্রিস্টানদের প্রশ্ন মুসলমানদের উত্তর * **প্রকাশক.** আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী * **স্বত্ব :** পরিবর্তন পরিবর্ধন না করার শর্তে লেখকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে যে কেউ বইটি প্রকাশ ও প্রচার করতে পারবে। ***প্রচ্ছদ.** নাজমুল হায়দার * **কম্পোজ.** যুবায়ের আহমদ * **প্রাপ্তিস্থান.** ইসলামী দাওয়াহ্ ইনস্টিটিউট, মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা; মাকতাবাতুস সালাম, বাংলাবাজার শাখা। এছাড়াও দেশের সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরীসমূহ।

শুভেচ্ছা মূল্য : ১৪০ টাকা মাত্র

ইনতেসাব

এই বইটি লিখতে সর্বপ্রথম যিনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, মানুষ গড়ার কারিগর, শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি, উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন, বাংলাদেশ ক্বওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাকুল মাদারিসুল আরাবিইয়্যাহ)-র ভাইস চেয়ারম্যান, ঐতিহ্যবাহী জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা এর প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস, পীরে কামেল

আল্লামা নূর হোছাইন কাসিমী সাহেব দা.বা.-এর সুস্থতা ও দীর্ঘ হায়াত কামনায় ।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই মহান স্রষ্টার, যিনি জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই ইবাদত করার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। পরিপূর্ণ রহমত নাযিল হোক সাহাবায়ে কেরাম ও আজ পর্যন্ত ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ ও ত্যাগ স্বীকারকারী মহামনিষীদের প্রতি।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আমাদের বর্তমান বইটি হলো 'খ্রিস্টানদের প্রশ্ন মুসলমানদের উত্তর'। আমরা যখন অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিতে যাই, বিভিন্ন স্থানে দেখি অনেক মুসলিম খ্রিস্টান হয়ে গেছে। খ্রিস্টানরা মূলত কুরআনের অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদের দাওয়াত দিয়ে খ্রিস্টান বানায়। এর জন্য বিভিন্ন বইও তারা সরবরাহ করে থাকে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করে। এই প্রশ্ন গুলোর উত্তর দা'য়ীদের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। এর জন্য আমি বিভিন্ন ওলামাদের শরণাপন্ন হই। কিন্তু এর উত্তর বের করতে তেমন গুরুত্ব দেখিনি। পরে নিজেই চেষ্টা শুরু করলাম। আমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। খ্রিস্টান ও মুরতাদ ভাইদেরকে লক্ষ্য করেই মূলত বইটি লেখা, যাতে তাদের সামনে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তারা যেন বুঝে, প্রচারকরা তাদেরকে কীভাবে ভুল বুঝাচ্ছে। সাথে সাথে আমাদের দা'য়ীদের জন্য এক বিরাট পাথেয় হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটিতে প্রথমে তাদের দাবি পেশ করেছি। সাথে সাথে তারা সেই দাবীর পক্ষে যেই দলিল পেশ করে, তা উল্লেখ করেছি। এরপর আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা পেশ করার চেষ্টা করেছি। আয়াত থেকে যেভাবে অপব্যাখ্যা করে তাও পেশ করেছি। এরপর তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছি। উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে কুরআন, বাইবেল এবং যুক্তির মাধ্যমে উপাস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

বইটি প্রকাশ করতে আমাকে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন, যাঁদের দুই একজনের নাম না বলেই পারছি না। তাঁরা হলেন ভাই আলহাজ্ব তালাত মোহাম্মদ তৌফিকে এলাহী, প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন ভাই আবদুল্লাহ (সুচন্দন কুমার মন্ডল) ও জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। আয়াতগুলোর তাফসীর বের করতে সহযোগিতা করেছেন বন্ধুবর মুফতি হাসান মাহমুদ শাকের ও তাঁর তাফসীর বিভাগের ছাত্ররা। আল্লাহ তা'আলা সকলের এখলাস ও সৎ নিয়তকে কবুল করে দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে কাজ

করার তৌফিক দান করুন।

সেই সাথে পাঠকদের খেদমতে বিনীত আরজ, মানুষ হিসেবে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই, আপনাদের দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে জানালে খুশি হবো এবং তৃতীয় সংস্করণে ঠিক করে দেয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের দ্বারা আল্লাহর বান্দাদের তাঁর দিকে ডাকার তৌফিক দান করেন। আমীন।

যুবায়ের আহমদ
ইসলামী দাওয়াহ্ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
মান্ডা শেষ মাথা, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪

প্রকাশকের কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

আজ খ্রিস্টানরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কুরআনের অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করছে। এ সব খবর শুনে আমি খুবই ব্যথিত হই। কারণ, তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যাচ্ছে। আমার খুবই ইচ্ছা ছিল এর জওয়াব মূলক কোনো বই প্রকাশ করবো। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি তিনি আমাকে 'খ্রিস্টানদের প্রশ্ন মুসলমানদের উত্তর' নামক বইটি প্রকাশ করার তৌফিক দান করেছেন।

হৃদয়ের গভীরতম কোণ থেকে একটি ক্ষীণ আশাই উৎসারিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে, যদি কোনো আল্লাহর বান্দা তাঁর ইচ্ছায় বইটি পাঠ করে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজে উৎসাহিত হয় এবং অন্যদের দাওয়াত দেয়ার মাধ্যম হয়, সেই উসিলায় আল্লাহ মালিক যদি আমাকে ও গ্রন্থকারকে তাঁর ক্ষমার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেন। সেই সাথে প্রবল প্রত্যাশা, এই কাজে সহযোগীসহ সকল পাঠক-পাঠিকাকেও যেন মেহেরবান মালিক কবুল করেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ রইল, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রণগত যেসব ভুলত্রুটি রয়ে গেছে সেজন্য আমি অনুতপ্ত। আমার এই অপরাধ মার্জনাযোগ্য মনে করে এই বইটির ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার জন্য আমার মালিকের নিকট এই প্রার্থনাই রইলো, তিনি যেন তাঁদের সাথে আমাকে ও গ্রন্থকারকে তাঁর ক্ষমার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেন।

তালাত মোহাম্মাদ তৌফিকে এলাহী
০৯-০৮-২০১৫ইং

ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ, (ভারত)- এর স্বনামধন্য মুহাদ্দিস আশরাফুল হেদায়ার মুসান্নিফ ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মাওলানা মুফতি জামিল আহমদ সক্রবী সাহেব দা.বা. এর দু'আ ও বাণী

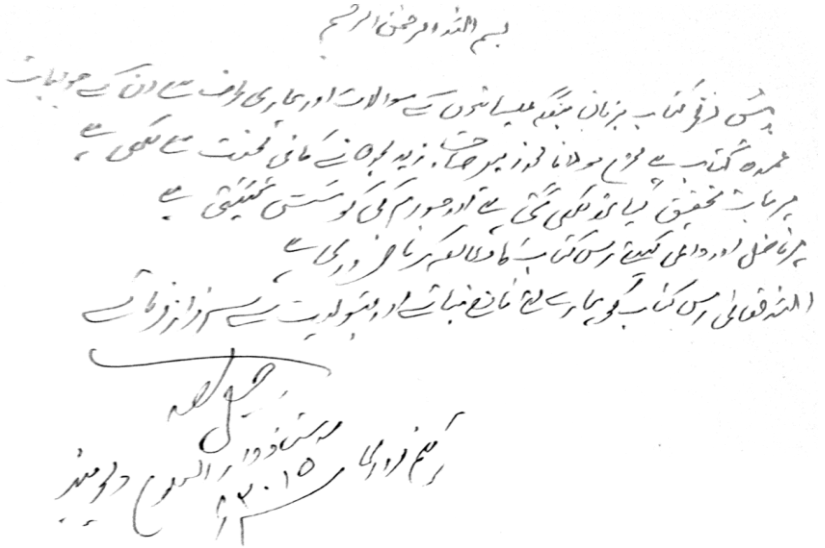

অনুবাদ

বক্ষ্যমান গ্রন্থ 'খ্রিস্টানদের প্রশ্ন মুসলমানদের উত্তর' সুন্দর একটি গ্রন্থ। মুহতারাম মাওলানা মুফতি যুবায়ের আহমদ সাহেব বইটি লিখতে যথেষ্ঠ মেহনত করেছেন। প্রতিটি কথা অত্যন্ত তাহকীক ও বিশ্লেষণ করে লিখেছেন এবং উদ্বৃতি দেয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি আলেম এবং দা'য়ীর জন্য এই বইটি পড়া খুবই জরুরী ।

আল্লাহ তা'আলা এই বইটিকে আমাদের জন্য উপকারী বানান এবং ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করুন। আমীন ।

জামিল আহমদ
উস্তাদ, দারুল উলুম দেওবন্দ ইউ,পি, ভারত
১লা ফেব্রুয়ারি- ২০১৫ ইং

আলেমুল শিরোমনি, দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার
সম্মানিত মুহাদ্দিস, হেফাজতে ইসলামের সম্মানিত মহাসচিব,
আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী (দা.বা.)-এর

দু'আ ও বাণী

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যিনি আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। দরুদ ও সালাম প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তার পরিবার ও পরিবর্গের উপর।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ফেতনার ছড়াছড়ি। মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে, কাদিয়ানি হচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন স্থানে মানুষ খ্রিস্টান হচ্ছে। তারা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন কলা-কৌশলে, কুরআনে কারীমের অপব্যাখ্যা করে খ্রিস্টান বানাচ্ছে। ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করে বই লিখে ধর্মান্তরিত করছে।

তাদের মোকাবেলায় উলামায়ে কেরাম কাজ করছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম মুফতি যুবায়ের আহমদ সাহেব তিনি খ্রিস্টানদের লেখা বিভ্রান্ত মূলক প্রশ্ন ও তারা আয়াতের যে সব অপব্যাখ্যা করেছে তার জওয়াব লিখেছেন। পান্ডুলিপির বিভিন্ন স্থান থেকে শুনলাম। বইটি খুবই তথ্যবহুল। দা'য়ীদের জন্য একটি হাতিয়ার এবং খ্রিস্টান প্রচারকদের জন্য দাঁত ভাঙ্গা জবাব।

আশা করি, 'খ্রিস্টানদের প্রশ্ন মুসলমানদের উত্তর' নামক বইটি সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য খুবই উপকার হবে। আমি দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা লেখকের কলম ও জবানকে দ্বীনের জন্য কবুল করেন। আমীন।

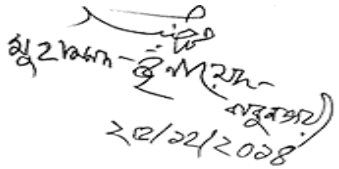

(আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী)

উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন, বাংলাদেশ ক্বওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাকুল মাদারিসুল আরাবিয়্যাহ)-র ভাইস চেয়ারম্যান,
ঐতিহ্যবাহী জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা- এর প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ও
শাইখুল হাদীস পীরে কামেল
আল্লামা নূর হোছাইন কাসিমী দা.বা.-এর

দু'আ ও বাণী

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

সারাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীরা বিভিন্ন কলা-কৌশলে কুরআনে কারীমের অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদের ঈমান হননের জন্য যেভাবে ধর্মান্তরিত-এর কাজ করছে তা খুবই দুঃখজনক। এমতাবস্থায় মুসলমানদের আর ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ নেই, এখনই সজাগ হতে হবে। চৌকান্না থাকতে হবে, কোনো চক্রান্তকারী যেন কারো ঈমান হরণ করতে না পারে। সাথে সাথে তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে ইসলামের সুশীতল ছায়ার দিকে, বাঁচাতে হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুন থেকে। আজ খ্রিস্টানরা কুরআনের অপব্যাখ্যা করে, ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করে বিভিন্ন বই লিখে সাধারণ মানুষকে খ্রিস্টান বানাচ্ছে।

আমার স্নেহভাজন মুফতি যুবায়ের আহমদ 'খ্রিস্টানদের প্রশ্ন মুসলমানদের উত্তর' নামে সুন্দর একটি বই লিখেছে। এর জন্য অনেক দিন আগে তাকে নির্দেশ দিয়ে ছিলাম। বইটি লিখতে গিয়ে অনেক মেহনত করেছে। আমি বিভিন্ন অংশ থেকে শুনেছি, আমার বিশ্বাস এই বইটি দাওয়াতের কর্মীদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি দাওয়াতি পথের পাথেয় হবে। খ্রিস্টান-মুসলিম সকল শ্রেণীর মানুষই এর দ্বারা উপকৃত হবে।

দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থকারের কলম ও জবানকে কবুল করুন, তাকে হেফাজত করুন এবং এই গ্রন্থটি সকল মানুষের হেদায়াতের জরিয়া বানান, এর সাথে প্রকাশক ও পাঠক সকলকে কবুল করুন। আমীন।

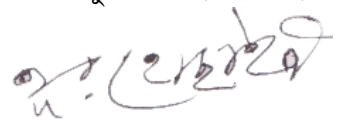

(হযরত মাওলানা নূর হোছাইন কাসিমী)

বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, মাসিক আত-তাওহীদ পত্রিকার সম্পাদক,
চট্রগ্রাম ওমর গণী এম.ই.এস বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইতিহাস ও
সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান
প্রফেসর ড. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন দা.বা. এর বাণী

বাংলাদেশের বিশিষ্ট দা'য়ী জনাব মাওলানা মুফতি যুবায়ের আহমদ সাহেব (ফাযিলে দেওবন্দ) কর্তৃক লিখিত 'খ্রিস্টানদের প্রশ্ন মুসলমানদের উত্তর' শীর্ষক পুস্তিকাটি দেখার সুযোগ হয়। মাশাআল্লাহ পুস্তিকাটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ও যুক্তিনির্ভর। খ্রিস্টানরা যে সব প্রশ্ন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে, অত্র পুস্তিকায় রয়েছে তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব। দাওয়াত ও তাবলীগে কর্মরত দা'য়ীদের জন্য এ পুস্তিকাটি হাতিয়ার হিসেবে কাজে দেবে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। পার্বত্য অঞ্চলের অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। শত শত খ্রিস্টান মিশনারী পাহাড়ী ও সমতলে বাসিন্দাদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে চলেছে। বহু মুসলমান ইতিমধ্যে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করে মুরতাদ হয়ে গেছে। এ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে নীরবে বসে থাকা আত্মহত্যার শামিল। দাওয়াতি ময়দানে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এটা সময়ের দাবি।

আমি অত্র পুস্তিকার ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি যেন বিজ্ঞ লেখক মাওলানা মুফতি যুবায়ের আহমদ সাহেবকে আরো বৃহত্তর পরিবেশে দ্বীনের খিদমত করার তাওফিক দান করেন, আমীন।

(ড. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন)

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

তাওরাত-ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে ১৭
বাইবেলে কুফর-শিরক এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ২২
ব্যভিচারের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড.....২২
কুরআন শুধু মক্কা ও তার আশেপাশের লোকদের জন্য.....২৫
তাওরাত, ইঞ্জিল কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না ৩২
প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিল আল্লাহ তা'আলার কালাম নয় বরং;
বিকৃত ও মানবরচিত গ্রন্থ..... ৩৬
পূর্ববর্তী কিতাব ও কুরআনে পার্থক্য করা যাবে না..... ৪০
কুরআন ও পূর্ববতী কিতাবসমূহের পার্থক্য ৪৪
পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে ৪৭
পূর্ববর্তী কিতাবে রয়েছে হেদায়াত ও নূর.....৫২
পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক ৫৬
কুরআনের মত তাওরাত-ইঞ্জিলও অবিকৃত..... ৬১
নবুওয়াত ও কিতাব বনী ইস্রায়েলের বংশে সীমাবদ্ধ ৬৫
দ্বিতীয়ত জবিহুল্লাহ কে? ৬৯
ঈমান আনতে হবে সকল আসমানী কিতাবের ওপর.....৮৯
কোথায় আছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা ? ৮১
ফায়সালা হবে ইঞ্জিল অনুযায়ী.....৮৭
পূর্বের কিতাব বাতিল হয়নি ৯১
খ্রিস্টধর্ম ভালোবাসার ধর্ম ৯৬
ইসলামধর্ম কঠিন আর খ্রিস্টধর্ম সহজ ৯৯
মুহাম্মদ সা. শাফায়াত করতে পারবেন না ১০১
আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা ১০২
যেভাবে অপব্যাখ্যা করা ১০২
হাদিস দ্বারা প্রমাণ নবী ১০৫

বিষয় পৃষ্ঠা

সকল মানুষ পাপী, আর পাপিরা জান্নাতে জাবে না ১০৭
একজনের পাপের কারণে অন্যকে শাস্তি দেয়া হবে না ১১
মানুষ জন্মগত ভাবে নিষ্পাপ ১১১
পাপের ক্ষমা করবেন আল্লাহ তা'আলা যীশু নয়.....১১১
খ্রিস্টধর্মের পরিত্রাণ কি বিশ্ব জনীন না নির্দিষ্ট জাতির জন্য? ১১১
বর্তমান কুরআন আসল কুরআন নয়.....১০৫
কুরআন সংকলনের ইতিহাস.....১১৬
রাসূলের যুগে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ.....১১৭
ওহী লিপিবদ্ধকরণ.....১২০
হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে কুরআন সংকলন ১২১
কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে
হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা.-এর কর্মপন্থা ১২৪
হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে কুরআন সংকলন ১২৫
রাসূল সা. খাদিজা (রা.) থেকে তাওরাত শিখেছেন.....১২৯
কুরআন হলো গাইড বই ১৩২
কুরআন না বুঝে পড়লে কোনো লাভ নেই..... ১৩৩
না বুঝিয়া নামায পড়লে দুর্ভোগ হবে.....১৩৭
জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে কোনো তরিকা মানলেই হবে.....১৩৯
মুসলমান হওয়ার লাভ বর্ণনা করা ১৪১
ইসলাম গ্রহণ না করার ক্ষতি ১৪২
ঈসা আ. একমাত্র মুক্তিদাতা.....১৪৩
ঈসা মসিহ"- শব্দের অর্থ.....১৪৫
যিশু পাপী -বাইবেলের সাক্ষী ১৪৮
বাইবেলে ভুল ১৪৯
২. সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারান্দার উচ্চতা বর্ণনায় ভুল ১৫০
৩. অবিয় ও যারবিয়ামের সৈন্যসংখ্যা বর্ণনায় ভুল.....১৫০
৪. ফল ভোজন ও মানুষের আয়ু বিষয়ক ভুল ১৫১

বিষয় পৃষ্ঠা

৫. যিশুর বংশতালিকায় পুরুষ গণনায় ভুল ১৫২
৬. মিসর পরিত্যাগের সময় ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা বর্ণনায় ভুল.....১৫২
৭. ইস্রায়েল সন্তানদের মিশরে অবস্থান সম্পর্কে ভুল তথ্য.....১৫৪
৮. ক্রুশের ঘটনার বর্ণনায় ভুল ১৫৬

বাইবেলে স্ববিরোধ ১৫৯
১. বিন্যামীনের সন্তানদের নাম ও সংখ্যায় বৈপরীত্য.....১৫৯
৩. অহসিয় রাজার রাজ্যগ্রহণকালীন বয়স বর্ণনায় বৈপরীত্য ১৬০
৪. সুলাইমান আ.-এর অশ্বশালার সংখ্যা বর্ণনায় বৈপরীত্য ১৬১
৫. যীশুর আগমন শান্তি না অশান্তির জন্য? ১৬১
ঈসা আ. নিজেই আল্লাহ ১৬৩
যীশুর ঈশ্বরত্বের প্রমাণাদির অসারতা.....১৬৭
যুক্তি খণ্ডন ১৭৪
তিন দিন পর তিনি পুনরায় জীবিত হলেন ১৭৬
কুরআন অনুযায়ী ঈসার অনুসারী কে? ১৮০
মুরতাদ ভাইদের প্রতি আমার আকুল আবেদন.....১৮২

তাওরাত-ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে

খ্রিস্টানদের দাবি: মুসলমানদেরকে তাওরাত-ইঞ্জিল অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নতুবা প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যাবে না।

তাদের দলিল:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ **لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ** وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

অর্থঃ বলে দিন: হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা কোনো পথেই নও, যে পর্যন্ত না তাওরাত-ইঞ্জিল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না কর, আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরি বৃদ্ধি পাবে, অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না।[৩]

[৩]. সূরা মায়েদা -৬৮

সঠিক ব্যাখ্যা :

প্রথম আয়াতে আহলে কিতাব ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশদান প্রশঙ্গে বলা হয়েছে, যদি তোমরা শরীয়তের নির্দেশাবলী পালন না কর, তবে তোমরা কিছুই নও। উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামী শরীয়ত অনুসরণ না করলে তোমাদের যাবতীয় সাধুতা ও ক্রিয়াকর্ম পণ্ডশ্রম মাত্র। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে একটি সৃষ্টিগত মর্যাদা দান করেছেন, অর্থাৎ, তোমরা পয়গাম্বরদের বংশধর। দ্বিতীয়ত: তাওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষাগত মর্যাদাও তোমাদের আয়ত্তধীন; তোমাদের মধ্যে অনেক সাধু ব্যক্তিও রয়েছে। তারা আধ্যাত্মিক পথে পরিশ্রম ও সাধনা করে। কিন্তু এসব বিষয়ের মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে তখনোই হবে। যখন তোমরা ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করবে। এছাড়া কোনো সম্পর্কই কাজে আসবে না এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনার কোনোটিতেই তোমাদের তোমাদের মুক্তি আসবে না।[৩] ,[৩]_

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে:

এই আয়াতটি তারা তিন ভাবে অপব্যাখ্যা করে।

১. আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক তাওরাত-ইঞ্জিল ও কুরআন শরীফ অনুসরণ করতে হবে। মুসলমান হিসেবে কুরআনের আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে।

২। উপরোক্ত আয়াতের আলোকে আমরা যদি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব 'অনুসরণ' কাজটি বর্তমান কাল, অর্থাৎ উক্ত কিতাবে যাহা আছে তাহা সর্ব সময় আমল করিতে বলা হয়েছে।[৩]"

৩। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ **لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ** হে আহলে-কিতাবগণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত-ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠিত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের

[৩] তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন-৩৪৫

[৩]. মাজহারী ৩/৬৮, তাফসীরে কুরতুবী ৬/৬৩, তাফসীরে বগভী ২/২২

[৩]. গুনাহ্গারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ-৮

কোনো ভিত্তি নেই।" অতএব, মুসলমানদেরকে তাওরাত-ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

উত্তরঃ

১. প্রথম দাবি, পূর্বের কিতাব অর্থাৎ "তাওরা-ইঞ্জিল" অনুসরণ করতে হবে। এই দাবির পক্ষে খ্রিস্টান প্রচারকগণ আয়াতের যেই অনুবাদ করেছে, তা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, এই আয়াতে কোথাও অনুসরণ করতে বলা হয়নি। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে অনুসরণ শব্দটি যোগ করেছে। অতএব, 'অনুসরণ' করার যে দাবি তারা করেছে তা নিতান্ত মনগড়া অনুবাদ। ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই না।

২. তারা ব্যাখ্যা করেছে–'অনুসরণ' শব্দটি বর্তমান কাল.....'। উক্ত আয়াতে যেহেতু অনুসরণ শব্দটিই নেই সুতরাং এর ব্যাখ্যা করাই অবান্তর। তাদের এই ব্যাখ্যাটিও একেবারেই মনগড়া ও ভিত্তিহীন। এবার খ্রিস্টানভাইদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা আপনারা তো তাফসীর ও হাদিস মানেন না। বলে থাকেন কুরআন থাকতে ব্যাখ্যা কিসের?

আপনারা উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা কিসের ভিত্তিতে করলেন? কোথায় পেলেন এই ব্যাখ্যা? আর কতদিন এভাবে ভুল অনুবাদ ও অপব্যাখ্যা করে মানুষকে জাহান্নামের পথ দেখাবেন? আসুন! ভুল ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করুন এবং সত্য জানুন। ইসলাম গ্রহন করুন। জান্নাতের পথে চলুন।

৩. উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খ্রিস্টান প্রচারকগণ লিখেছেন, 'উক্ত আয়াত অনুযায়ী মুসলমানদেরকে কুরআনের আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে অর্থাৎ তাওরাত-ইঞ্জিল অনুসরণ ও মানতে হবে।' তাদের এই ব্যাখ্যাটিও সম্পূর্ণ মনগড়া।

এ পর্যায়ে খ্রিস্টান ভাইদেরকে দাওয়াত দিতে চাই, ভাই! আপনি এসব মনগড়া ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করুন। কারণ, ইসলাম-ই হলো আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম। দেখুন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ-

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (১৯)

অর্থঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ তা'আলা হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।[১]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।[২]

আপনি খ্রিস্টধর্ম ছেড়ে দিন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলারনিকট ইসলাম-ই হলো একমাত্র মনোনীত ধর্ম। আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুন। কারণ, ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনের নির্দেশ মানতে গিয়েই আপনাকে মুসলমান হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছি।

আরো শুনে রাখুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কী বলেন–

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (১) اللَّهُ الصَّمَدُ (২) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (৩) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

অর্থঃ বলুন, তিনি আল্লাহ তা'আলা, এক। ২.আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী। ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। ৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

অর্থাৎ. আপনি একত্ববাদকে গ্রহণ করুন। ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করুন। আপনি যদি মুরতাদ হয়ে থাকেন অর্থাৎ মুসলমান থেকে খ্রিস্টান হয়ে

---

১. আল ইমরান-১৯

২. আল ইমরান-৮৫

থাকেন, তাহলে ইসলামে ফিরে আসুন। আপনি টাকার লোভে পড়ে তাদের শিখানো কিছু বুলি শিখে, মানুষকে ভুল ধর্মের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন। ফলে, আপনার দুনিয়া ও আখেরাত সবকিছুই নষ্ট করছেন। আমি চাই না আপনি আমার ভাই হিসেবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হোন। চাই না আপনি তপ্ত আগুনে জ্বলুন।

৪. উল্লিখিত আয়াতে يَا أَهْلَ الْكِتَابِ বলে আহলে কিতাবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। (যাদেরকে পূর্বে কিতাব দান করা হয়েছে) অর্থাৎ, ইহুদী-খ্রিস্টানদেরকে। মুসলমানদেরকে নয়। তাদের নিজেদেরকেই তাওরাত-ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমন দৃষ্টান্ত কুরআনে অনেক আছে। যেমন– বলুন, হে কাফিরগণ![৩] বলুন, হে আহলে কিতাবগণ অর্থাৎ ইহুদী-খ্রিস্টান। এমন বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে সম্বোধন করে নির্দেশ প্রদান করেছেন। এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে ইহুদী-খ্রিস্টানদেরকে ।

৫. (ক) এই আয়াতে ইহুদী-খ্রিস্টানদেরকে বলা হয়েছে, তাওরাত ও ইঞ্জিলে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা যেন প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে মেনে নেয় ও মুসলমান হয়ে যায়।

(খ) তাওরাত-ইঞ্জিল বিকৃত ও রহিত হওয়ার পরেও যেসব বিধি-বিধান শরীয়তে মুহাম্মদীতে বিদ্যমান আছে। যেমন: একত্ববাদ ও দশ-আজ্ঞা, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সেগুলি প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি খ্রিস্টান ভাইদেরকে বলবো-আপনারা যদি এই আয়াত অনুযায়ী তাওহীদ তথা একত্ববাদ ও দশ-আজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করতেন, শির্ক ও ব্যভিচারের শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতেন, তাহলে মানব সভ্যতা বর্তমানে এতো অবক্ষয়ের মধ্যে পড়তো না। নিম্নে বাইবেল থেকে কুফর-শিরক ও ব্যভিচারের শাস্তির বিবরণ তুলে ধরা হলো। আপনারা তাওরাত-ইঞ্জিলের নিম্নের বিধানগুলো প্রতিষ্ঠা করুন।

বাইবেলে কুফর-শিরক এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

---

৩. সূরা কাফিরুন-১

বাইবেলে আছে-আর যদি ঐদিন কোনো ব্যক্তি, পুরুষ, নারী, ছোট-বড়, যে কেউ কোনো মূর্তি, প্রতিমা, ছবি প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করে, শিরক করে বা শিরকের প্রচারণা করে বা প্ররোচনা দেয়, তাহলে তাকে পাথরের আঘাতে হত্যা করতে হবে। এমনকি যদি কোনো নবীও অনেক মুজেযা দেখানোর পর কোনোভাবে শিরকের প্ররোচনা দেন, তাহলে তাকেও পাথরের আঘাতে হত্যা করতে হবে। যদি কোনো জনপদবাসী শিরকে পতিত হয়, তাহলে সে গ্রামের বা নগরের সকলকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে এবং সে গ্রামের পশু-পক্ষি হত্যা করতে হবে। গ্রামের সকল সম্পদ ও দ্রব্যাদি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এক্ষেত্র তওবার কোনো সুযোগ নেই।[৩]

ব্যভিচারের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড [৩]

এমনকি পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাতকে ঈসা মসীহ ব্যভিচার বলে গণ্য করেছেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে তার চোখ তুলে ফেলে দিতে বলেছেন। তিনি বলেন "যে কেহ কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যাভিচার করিল। আর তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তার বিঘ্ন জন্মায় তবে তাহা উপড়াইয়া দূরে ফেলে দাও, কেননা সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং একটি অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভালো।[৩]

অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

অর্থ: বলুন, হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান; আমরা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না; তার সাথে কোনো শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়া কাউকে প্রতিপালক বানাব না।

---

৩. যাত্রাপুস্তক- ২২ঃ২০, ৩২ঃ২৮। ২য় বিবরণ- ১৩ঃ১-১৬, ১৭ঃ২-৭। ১ম রাজাবলি- ১৮ঃ৪০।

৩. লেবীয়- ২০ঃ১০-১৭।

৩. মথি- ৫ঃ২৮-২৯।

তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।[৩]

এবার আমি খ্রিস্টান ভাইদেরকে বলতে চাই, "ভাই! আপনাদের প্রতি কুরআন নির্দেশ দিয়েছে। আপনারা তাওরাত-ইঞ্জিলের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করবেন, তাওরাত-ইঞ্জিলের নামে শিরক ও ব্যভিচার প্রতিষ্ঠা বা প্রচারের নির্দেশ দেন নি। আগে আপনারা খ্রিস্টানগণ আপনাদের ব্যক্তি, দেশ ও রাষ্ট্রগুলিতে তাওরাত-ইঞ্জিলের তাওহীদ ও বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করুন। শিরক, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপের শাস্তি প্রতিষ্ঠা করুন-যা আপনাদের কিতাব নির্দেশ দেয়। সকল খ্রিস্টান চার্চে ঈসা মসীহ, তার মাতা মরিয়ম ও অন্যান্য অগণিত মানুষের প্রতিমা বিদ্যমান। তাওরাত-ইঞ্জিলের বিধান অনুসারে এগুলো ধ্বংস করুন। যারা এগুলিকে বানিয়েছে, এগুলোতে ভক্তি বা মানত-উৎসর্গ করেছে বা উৎসাহ দিয়েছে। তাদের সকলকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করুন। এরপর তাওরাত-ইঞ্জিল নিয়ে আসুন।"

আচ্ছা ভাই! আপনারা কোন তাওরাত ইঞ্জিলের কথা বলছেন? ঈসা আ.-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর ৩০০ বছরের মধ্যে যেই ইঞ্জিল ছিল, এমন একটি ইঞ্জিল দেখাতে পারবেন কি? নিশ্চয়ই, পারবেন না। আপনাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও পারে নি। আরও একটি অনুরোধ রইল- আপনারা এভাবে কুরআনের অপব্যাখ্যা করবেন না। পারলে আপনাদের বাইবেল দ্বারা ধর্ম প্রচার করুন যদি আপনারা সেটাকে সঠিক বলে বিশ্বাস করেন। আপনাদের জন্য দুআ করি, আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে হেদায়াত দান করুন। ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। জাহান্নামের চিরস্থায়ী আগুন থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন। আমিন।

---

৩. সূরা আলে ইমরান-৬৪

কুরআন শুধু মক্কা ও তার আশেপাশের লোকদের জন্য

খ্রিস্টানদের দাবি: কুরআন শুধুমাত্র মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের জন্য নাযিল হয়েছে।

তাদের দলিল:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.

অর্থ: এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবি ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশে-পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে- যাতে কোনো সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৩]

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা :

"হাওলাহা" শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪নং খন্ডের. ১০৯নং পৃ: রয়েছে ('মিন সায়িরিল বিলাদী শারকান ওয়া গারবান') সারা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে।

আর তাফসীরে কুরতুবীতে ১৬নং খন্ডের ৬নং পৃ: রয়েছে ('মিন সায়িরিল খলকি') সকল সৃষ্টি। আর তাফসীর বগভী ৪/১২০ রয়েছে ('কুরাল আরযী কুল্লাহা') পৃথিবীর সকল ভূমি। সুতরাং, এ সমস্ত তাফসীরের মাধ্যমে বুঝা গেল 'হাওলাহা' দ্বারা সমস্ত পৃথিবী বুঝানো হয়েছে।

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে:

খ্রিস্টানগণ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে চায়, কুরআন শুধুমাত্র মক্কাবাসী ও তার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি এলাকার জন্য। যেমন তাদের বই 'গুনাহগারদের জন্য বেহেস্তে যাওয়ার পথ' নামক, বইয়ের ১৩নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে...."কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করা হয়েছে আরবি ভাষায়, যাতে মক্কা ও তার চতুর্দিকের জনগণকে সতর্ক করতে পারে। এখানে মনে রাখা উচিৎ চতুর্দিকের বলতে সমস্ত বিশ্বকে বুঝায় না। অর্থাৎ মক্কা ও তার চতুর্দিকের আরবি ভাষাভাষী লোকদের বুঝায়।[৩]"

---

৩. সূরা শূরা-৭।

৩. গুনাহ গারদেজন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ-১৩

আমরা হলাম বাংলাদেশি, মক্কা থেকে অনেক দূরে- সুতরাং কুরআন আমাদের জন্য নয়। দ্বিতীয় বিষয় হলো কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আরবি ভাষায়, আরবদের জন্য। আমাদের ভাষা হলো বাংলা। আরবি আমাদের ভাষা নয়। অতএব, কুরআন আমাদের জন্য নয়।

১নং উত্তর :

১. حَوْلَهَ অর্থ চারপাশ, মক্কা হলো পৃথিবীর নাভি। মূল কেন্দ্রবিন্দু। 'চারপাশ' বলার দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না। যেমন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মক্কা ছাড়াও কেসরা, কায়সার, শাম, য়েমেন ইত্যাদি দেশে দাওয়াত দিয়েছেন। আধুনিক বর্তমান বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, গোলাকার পৃথিবীর মধ্যস্থল হলো মক্কা নামক নগরী। অতএব حَوْلَه দ্বারা পুরো পৃথিবীই উদ্দেশ্য। পুরো পৃথিবীর মানুষকেই কুরআন মানতে হবে। আর কুরআন হল সকল মানুষের জন্য।

২. কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ

অর্থ: "রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা 'মানুষের' জন্য হেদায়েত"। [৩]

২নং উত্তর :

আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে حَوْلَهَ দ্বারা কোনো সীমানা নির্দিষ্ট করেন নি। বলেননি যে, চতুর্পাশে ৩০ মাইল বা ৪০ মাইল, ইত্যাদি। এমন কোনো সীমানা ধার্য করেন নি। এই আয়াতই-প্রমাণ করে কুরআন হলো বিশ্বজনীন।

৩নং উত্তর :

মক্কায় তৎকালীন সময়ে সকল জাতির লোক বসবাস করত। তাই তাকে উম্মুল কুরা বা প্রাণকেন্দ্র বলা হয়েছে। যেমন, ঢাকা বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র। এখানে, পুরো দেশের সব জাতির লোক বসবাস করে। আর "উম্মুল কুরা" বলে কখনই প্রমাণ হয় না যে, কুরআন শুধুই মক্কাবাসীর জন্য ।

৪নং উত্তর

তারপরও যদি কেউ একথা মানতে না চাই যে, তিনি সমস্ত পৃথিবীর জ্বীন ও মানবের নবী ছিলেন। তাহলে, আমরা বলবো তোমার কথা যদি আমরা কিছুক্ষণের জন্যও মেনে নেই যে, তিনি মক্কা ও তার আশেপাশের লোকদের নবী ছিলেন গোটা পৃথিবীর নবী ছিলেন না। তবে স্মরণ রেখো যেহতু মক্কাবাসী ও তার আশে পাশের লোকেরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী ও আশেপাশের মানুষ ছিলন। এই কারণে তারাই ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার বেশী হকদার ছিল। কারণ কুরআন ও হাদীস দ্বারা নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী আশেপাশের মানুষের সবচেয়ে বেশী অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে। তাই, বিশেষ করে তাদের কথাই বলা হয়েছে। আর আমরা জানি বিশেষ ভাবে কাউকে বলার দ্বারা অন্যরা উক্ত হুকুম থেকে বের হয়ে যায় না। এর অসংখ্য প্রমাণ আমাদের সামনে রয়েছে। "ওয়ামা আর্‌সাল্‌নাকা ইল্লা কাফ্‌ফাতাল লিন্নাস" (সূরা সাবা আয়াত ২৮.) আমি আপনাকে সারা পৃথিবীর সকল মানুষের নবী ও রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছি।

(তাফসীরে কাসির ৯/৫৮০) মক্কা নগরীকে উম্মুল কুরা বলার কারণ হলো, 'উম্মা' অর্থ হলো মূল। উম্মুল কুরা অর্থ জনপদসমূহের মূল অর্থাৎ মক্কা। পৃথিবীর মধ্যে মক্কা সবচে সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন স্থান, পাশাপাশি তার মধ্যে বায়তুল্লাহ থাকার কারণে এটা উম্মুল কুরা । [৩]

আমি খ্রিস্টান প্রচারকদের জিজ্ঞাসা করবো, আপনাদের বাইবেলে কোথায় আছে 'বাইবেল সকল মানুষের জন্য?' আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, বাইবেলের কোথাও নেই তাওরাত-ইঞ্জিল সকল মানুষের জন্য বা বাংলাদেশিদের জন্য। আপনি যেই গ্রন্থকে বিশ্বাস করছেন সেটাই তো আপনার জন্য নয়। যেটা আপনার জন্য নয়, সেটা বিশ্বাস করছেন কেন? মানছেন কেন? বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবুন, চিন্তা-ফিকির করুন। এরপর

৩. সূরা বাকারা -১৮৫।

৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/১০৯

সিদ্ধান্ত নিন। সত্যের উপর আছেন, না মিথ্যার উপর চলছেন। পক্ষান্তরে কুরআন সকল মানুষের জন্য হেদায়াতনামা। চাই মানুষটি খ্রিস্টান হওক, হিন্দু হওক, মুসলমান হওক, যেই হোক না কেন, সকল মানুষের জন্য এই কুরআন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "রমযান মাস-ই হল সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন যা মানুষের জন্য হেদায়েত"

হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলিম সকলেই মানুষ। আর কুরআনও সকল মানুষের জন্য। অতএব, কোনো খ্রিস্টান যদি মানুষ হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে কুরআন মানতেই হবে। তবেই সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।

খ্রিস্টান প্রচারকদের বলবো, আপনি এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে পারবেন না। কারণ, আপনি যে ধর্মীয় গ্রন্থ বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দাস মানেন, তাতেই লেখা আছে যে যীশু শুধুমাত্র বনী ইস্রাইলদের নিকট প্রেরিত হয়েছেন। যেমন, যীশু বলেন- "আমাকে শুধু বনী ইস্রায়েলের হারানো মেষদের নিকট পাঠানো হয়েছে।°

আরো বলা হয়েছে- "তোমরা অইহুদীর নিকট যেয়ো না। বরং ইস্রায়েল জাতির হারানো ভেড়াদের কাছে যেয়ো।°" এ ধর্ম মানতে হলে আপনাদেরকে ইসরাঈলে যেতে হবে। কারণ, সেখানে বনি ইস্রায়েলের লোকজন থাকে।

৫নং উত্তর:

আমি খ্রিস্টান প্রচারকদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, "এই আয়াতটি কে বেশি বুঝেছেন? আপনি? না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার ওপর এই আয়াত নাযিল হয়েছে। যদি বলেন তিনি বুঝেছেন। তাহলে, বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেল- আপনার বুঝাটা ভুল, কুরআনই সঠিক।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আরবি। তাই, তাঁর ভাষাতেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

এবার খ্রিস্টানভাইদেরকে জিজ্ঞাসা করবো, "বলুন তো, আপনাদের বাইবেল, তাওরাত ও ইঞ্জিল কোন ভাষায়? ঈসা নবী কোন ভাষায় কথা বলতেন? তাহলে আপনারা বলবেন তাঁর ভাষা ছিল অরমীয়। বাইবেল লেখা হয়েছে কোন ভাষায়? আপনারা বলবেন হিব্রু ভাষায়। যেই ভাষায় ঈসা নবী কথা বলতেন, ইঞ্জিল প্রচার করতেন, সেই ভাষায় ইঞ্জিল লেখা হলো না, লেখা হলো অন্য ভাষায়। এমনটি কেন? প্রথমেই ভাষার হেরফের হয়ে গেল, পরবর্তীতে যেই ভাষায় অর্থাৎ হিব্রু ভাষায় ইঞ্জিল বা বাইবেল লেখা হলো, সেই ভাষা কি এখনো প্রচলিত আছে? নেই। সেই ভাষার প্রচলন এখন কোথাও নেই।

আমি চ্যালেঞ্জ করলাম, ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার পর থেকে ৩০০ বছরের মধ্যে কোনো ইঞ্জিল কেউ দেখাতে পারবে না। আমি বহু খ্রিস্টান ভাইদের এই ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়েছি, কেউ দেখাতে পারেনি। আর পারবেই বা কীভাবে? নেই তো; যা আছে তার মধ্যে আবার অসংখ্য ভুল। বিকৃতির তো অভাবই নেই। বৈপরিত্যের তো কথাই নেই। যা সামনে বিস্তারিত বলা হবে ইনশাআল্লাহু তা'আলা । বর্তমানে আমরা যেই বাইবেল দেখি, তা হলো বাংলা অনুবাদ। কিন্তু, সাথে আসলটি দিয়ে দেয়া উচিৎ ছিল, সেটিও নেই।

পক্ষান্তরে, কুরআন আরবি ভাষায়। যেই নবীর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁর ভাষাও ছিল আরবি। প্রত্যেক নবীর উপর যেই কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সেই নবীর মাতৃভাষায় ছিল।

প্রিয় পাঠক! একটি বিষয় ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করুন, তা হলো কুরআন মূলত লিখিতভাবে আসেনি। আল্লাহ তা'আলা তা মানুষকে মুখস্থ করিয়ে অন্তরে অন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। এই ভাষা মুখস্থ করাও সহজ। লক্ষ লক্ষ কুরআনের হাফেজ রয়েছে, যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে সংরক্ষণ করেছেন। পৃথিবীর সকল কুরআনকে যদি বিলীনও করে দেওয়া হয়, তাহলে হুবহু সেই কুরআন লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। একটি বিন্দু বা যের-যবরেও পরিবর্তন হবে না। পক্ষান্তরে পুরো পৃথিবীতে বাইবেলের একটি হাফেজও কোনো খ্রিস্টান দেখাতে পারবে না । এ আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় কুরআন অবিকৃত ও সকল মানুষের জন্য।

তাছাড়া, কুরআন যদি অন্য কোনো ভাষায় নাযিল হতো, তাহলে সেই এলাকা থেকে নবীর ভাষা শিখে, নিজ এলাকায় শিখাতে হতো, এতে এক বড় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

---

°. ম থির ১০ঃ ৫ ।

°. মথি ১৫/২৪

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

অর্থ: আমি সব পয়গাম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৩]

এই বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, কুরআন সকল মানুষের জন্য। সঠিক পথ পেতে হলে সকল মানুষকে আল্লাহ তা'আলার কালাম পবিত্র কুরআন পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে। আমি খ্রিস্টান ভাইদেরকে অনুরোধ করবো, "আপনারা কুরআনকে আপনার আল্লাহ তা'আলার কালাম মনে করে পড়ুন। সাথে সাথে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।"

৩. সূরা ইব্রাহিম-৪

তাওরাত, ইঞ্জিল কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না

খ্রিস্টানদের দাবি: আল্লাহ তা'আলার বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তাওরাত, ইঞ্জিল, কিতাবুল মুকাদ্দাস আল্লাহ তা'আলার কালাম। এইগুলো কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না।

খ্রিস্টানদের প্রমাণঃ

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থ: তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহ তা'আলার কথার কখনো হের-ফের হয় না। এটাই হলো মহা সফলতা।[৩]

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ

"আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গাম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। তারা এতে সবর করেছেন **আল্লাহ তা'আলার বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।** আপনার কাছে পয়গাম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে।"[৩]

আয়াতের সঠিক তাফসীর :

আপনার পূর্বে অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে; কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও (বিভিন্ন ধরনের) কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ধৈর্যধারণ করেছিল যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে। (যার মাধ্যমে বিরোধীরা পরাজিত হয়েছে) (এমনিভাবে আপনিও ধৈর্যধারণ করুন, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আপনার কাছে আসবে।) কারণ আল্লাহ তা'আলার কথার (সাহায্য-সফলতার ওয়াদা সমূহ) কোনো পরিবর্তনকারী নেই।[৩]

৩. ইউনুস-৬৪
৩. সূরা আনআম–৩৪
৩ সূরা আন-আম- ৩৪

وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ

সুতরাং, 'আল্লাহ তা'আলার কথা' বলতে দুনিয়া আখিরাতে সাহায্য ও সফলতার কথা বুঝানো হয়েছে।

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে :

খ্রিস্টানদের রচিত বই "গুনাহগারদের বেহেস্তে যাওয়ার পথ" এর ৮নং পৃষ্ঠায় এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করেছে এভাবে–

"তাই যখন আমি বলি খ্রিস্টান, ইহুদীগণ কিতাব বদলাইয়া ফেলিয়াছে তখন আমি উপরিউক্ত আয়াত অস্বীকার করিতেছি না? আমরা যদি বলি শুধু কুরআন শরীফই আল্লাহ তা'আলার কালাম, তখন কি আমরা আল্লাহ তা'আলার কালামকে অস্বীকার করিতেছি না? তাওরাত, ইঞ্জিল ও কিতাবুল মুকাদ্দাস এইগুলো আল্লাহ তা'আলার কালাম। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে তাঁর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। সুতরাং, এই গ্রন্থগুলো প্রতিষ্ঠা করতে হবে এইগুলো পরিবর্তন হয়নি।[৩]

১নং উত্তর :

উপরোক্ত আয়াতে কালেমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি)। আয়াতের শুরুতে যেই ওয়াদা গুলো করা হয়েছে সেই ওয়াদা কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না।[৩]

وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রা. বলেন: "আল্লাহ তা'আলারবাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাহ সমূহ। এই ওয়াদাগুলো মজুবত করা"[৩]

২নং উত্তর :

খ্রিস্টান ভাইদেরকে আমি বলব, প্রথমে আপনি প্রমাণ করুন বাইবেল, কিতাবুল মুকাদ্দাস, তাওরাত-ইঞ্জিল এগুলো আল্লাহ তা'আলার কালাম। একথা কুরআন ও বাইবেলে কোথাও নেই। তাওরাত, ইঞ্জিল, কিতাবুল মুকাদ্দাস আল্লাহ তা'আলার কালাম একথা হলো মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য খ্রিস্টান প্রচারকদের মনগড়া বানানো একটা কথা। যার কোনো প্রমাণ নেই। উপরি উক্ত আয়াত থেকে একথা কখনো প্রমাণিত হয় না যে, তাওরাত-ইঞ্জিল আল্লাহ তা'আলার কালাম।

৩নং উত্তর :

প্রচলিত তাওরাত, ইঞ্জিল বা বাইবেল কোনটিই যেহেতু আল্লাহ তা'আলার কালাম নয়, তাই এগুলো পরিবর্তন হতেই পারে। বর্তমান তাওরাত-ইঞ্জিল ও বাইবেলে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার অসংখ্য প্রমাণ বাইবেলে বিদ্যমান। তার কিছু প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করছি।

সেগুলো থেকে মাত্র একটি প্রমাণ এখানে পেশ করছি

১. কেরী বাইবেলের ভূমিকাতেই লেখা হয়েছে "গত দুইশত বৎসরে বেশ কয়েকবার এই বাইবেল সংশোধিত হয়েছে এবং প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে শেষ বারের মতো সংশোধিত হইয়া ছিল বলিয়া জানা যায়। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে দুই বাংলার বাইবেল সোসাইটির নীতি নির্ধারকগণ বর্তমান প্রজন্মের জন্য বাইবেলের আরও একটি সংশোধনের প্রয়োজন আছে বলে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেন।[৩]

প্রিয় পাঠক! আপনি-ই বলুন– আল্লাহ তা'আলার কালামের কি কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হয়?। আর যেটা সংশোধনের প্রয়োজন হয়, সেটা আল্লাহ তা'আলার কালাম নয়। বাইবেল বা কিতাবুল মুকাদ্দাস ইত্যাদির যেহেতু সংশোধনের প্রয়োজন হয়। তাই এগুলো আল্লাহ তা'আলার কালাম নয়। এর মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়। এর জ্বলন্ত একটি প্রমাণ নিম্নে পেশ করছি। 'বাইবেলের ২বংশাবলী ২১:২০; এ আছে অহসিয়র পিতা যিহুরাম রাজার বিবরণ। তিনি ৩২ বছর বয়সে রাজত্ব লাভ করেন। ৮ বছর রাজত্ব করেন। এরপর তিনি মারা যান। মৃত্যুকালীন সময় তার বয়স ছিল ৪০ বছর। তার মৃত্যুর পর তারই কনিষ্ঠ ছেলে অহসিয় রাজত্বভার গ্রহণ করেন। সে সময় তার বয়স ছিল ৪২ বছর। তাহলে বোঝা গেল পিতার চেয়ে ছেলে দুই বছরের বড়'। আর পিতা পুত্রের চেয়ে দুই বছরের ছোট।

---

৩. গুনাহ গারদেজন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ-৮

৩. তফসিরে আশ্রাফি পৃ:২০০

৩. সফওয়াতু তাফাসির ১. খন্ড পৃ:৩৭৮

৩. কেরী বাইবেল ভুমিকা,

প্রিয় পাঠক! এটা ছিল কেরী বাইবেলের তথ্য। মজার বিষয় হলো, বাইবেলের পরবর্তী সংস্করণে(জেনারেল ভার্সন) ৪২বিয়াল্লিশ এর স্থানে ২২ বাইশ বছর লাগিয়ে দিয়েছে। এবার আপনারা বলুন, এটা যদি আল্লাহ তা'আলার কালাম হয়, তাহলে ৪২ বিয়াল্লিশ বছর পরিবর্তন করে ২২ লাগানোর বা পরিবর্তনের দায়িত্ব মানুষের কাঁধে তুলে নিল কেন?

৪নং উত্তর :

প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিল আল্লাহ তা'আলার কালাম নয়, বরং পরিবর্তিত একটি গ্রন্থ। এখানে কুরআন থেকেই তার প্রমাণ পেশ করছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

"আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জানো যে, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর ওপর শক্তিমান?"[৩]

---

৩. সূরা বাকারার ১০৬

প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিল আল্লাহ তা'আলার কালাম নয়

প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিল আল্লাহ তা'আলার কালাম নয়; বরং বিকৃত ও মানবরচিত গ্রন্থ, কুরআনে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ উল্লেখ করলাম।

১ নং প্রমাণ:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (৭৯).

অতএব, তাদের জন্য আফসোস। যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ- যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব, তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাতের লেখার জন্যে এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের উপার্জনের জন্যে।"[৩]

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত কুরআনের বিবরণী থেকে বুঝতে পেরেছেন তারা কীভাবে তাদের ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তন করেছে। এখনও পোপ বা ফাদারগণ টাকার বিনিময়ে পাপ ক্ষমা করিয়ে দেন। কোনো খ্রিস্টান যদি বড় ধরনের পাপকর্ম করে, তারা পোপের কাছে টাকা দিয়ে পাপ মার্জনা করিয়ে আনে। আয়াতের দ্বিতীয় অংশ তাদের বাস্তব কর্মের সাথে মিলে যায়। আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাদের জন্য আক্ষেপ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সকল খ্রিস্টান ও অমুসলিম ভাই-বোনকে তাঁর কথাগুলো অনুধাবন করার তৌফিক দিন এবং হেদায়াত দান করুন। আমিন।

২নং প্রমাণ:

প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিল আল্লাহ তা'আলার কালাম নয়। এগুলোর পূর্বের কিতাবে যা কিছু ছিল সেগুলোও তারা পরিবর্তন করেছে। দেখুন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

---

৩. সূরা বাকারা ৭৮-৭৯ ,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ **يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ.**

"হে রসূল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না যারা দৌড়ে গিয়ে কুফুরিতে পতিত হয়, যারা মুখে বলে: 'আমরা মুসলমান' অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইহুদি, মিথ্যা বলার জন্যে তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। তারা অন্যদলের গুপ্তচর বৃত্তি করা, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে।"[৩]

এই আয়াতের প্রথম অংশের সম্বোধনটি মিলে যায় বর্তমান কিছু খ্রিস্টানদের সাথে। তারা নিজেদের মুসলমান হিসেবে দাবি করতে চায়। নিজেদেরকে 'ঈসায়ী মুসলিম' বলে। কোথাও আবার 'আহলুল কুরআন' বলে পরিচয় দেয়। মূলত, এরা খ্রিস্টান। মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার জন্যই এসব নাম ব্যবহার করে থাকে। তারা মুসলমানদেরকে 'কিতাবুল মোকাদ্দাস' নামক একটি ধর্মীয় গ্রন্থ দেয়। গ্রন্থটি মূলত বাইবেল। মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার জন্য বাইবেলে যোগ করেছে ইসলামী পরিভাষা। বাদ দিয়েছে হিন্দুদের পরিভাষা। যেমন যীশুর স্থানে হযরত 'ঈসা', নতুন নিয়মের স্থানে ইঞ্জিল শরীফ ইত্যাদি।

হে আল্লাহ তা'আলা! তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। মুসলমানদেরকে তাদের চক্রান্ত থেকে হেফাজত করুন। এব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন- "তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে।" যেমন, বাইবেল পরিবর্তন করে বানিয়েছে কিতাবুল মুকাদ্দাস। এমন বহু প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। বইটির কলেবর বৃদ্ধির জন্য এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

৩নং প্রমাণ:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ.

" হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন। **কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে**, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে এসেছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ।"[৩]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে তাদের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। কুরআনে এসেছে- এ গ্রন্থকে খ্রিস্টানদের মানা উচিত। এটি একটি সমুজ্জল গ্রন্থ।

পবিত্র কুরআনের বাণী দ্বারা পরিষ্কারভাবে আমরা জানতে পারলাম, ইহুদি-খ্রিস্টানগণ তাদের গ্রন্থের কিছু অংশ গোপন করেছে, নিজ হাতে লিখে পরিবর্তন করে দিয়েছে। আর বলছে, এইগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আল্লাহ তা'আলার বাণী। এছাড়া, আরও বহু প্রমাণ কুরআনে বিদ্যমান। এখানে, কয়েকটি উল্লেখ করলাম। [৩]

সুতরাং, উক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল, বর্তমান প্রচলিত ইঞ্জিল যদি ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল হতো, তাহলে কখনো সেই গ্রন্থে তাঁতে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পরবর্তী ঘটনা থাকতো না। তাওরাত-ইঞ্জিল যদি আল্লাহ তা'আলার বাণী-ই হতো, তবে এই বইবেলে কোনো প্রকারের ভুল-ভ্রান্তি, বৈপরীত্য বা অশ্লীল কথা থাকতো না। অথচ, তাতে রয়েছে হাজারো ভুল ও বৈপরিত। বহু ইহুদি-খ্রিস্টান-গবেষক তাদের গ্রন্থের উপর গবেষণা করে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে-এই গ্রন্থ নবীগণের অনেক পরবর্তী যুগের কোনো ব্যক্তিবর্গের রচিত। ফলে, এতে রয়েছে ব্যাপক ভুল-ভ্রান্তি ও বৈপরিত্য। এ বিষয়ে সামনে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ তা'আলা ।

সুতরাং, বর্তমান কথিত তাওরাত, ইঞ্জিল ও কিতাবুল মুকাদ্দাস যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বাণী নয়, তাই পবিত্র কুরাআন তথা আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা তাওরাত-ইঞ্জিল পরিবর্তিত না হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করা নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার। "কথায় আছে চুরির চুরি আবার সিনাজুরি।"

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমিন।

---

৩. সুরা মায়েদা-৪১

৩. সূরা মায়েদা-১৫

৩. আরো দেখুন সূরা বাকারা -৭৫ সূরা ঈসা-৪৬ নং আয়াতে।

পূর্ববর্তী কিতাব ও কুরআনে পার্থক্য করা যাবে না

খ্রিস্টানদের দাবী: পূর্ববর্তী কিতাব, তথা বাইবেল- কিতাবুল মুকাদ্দাস ও কুরআনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না।

তাদের দলিল:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ .

অর্থ: এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের ওপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের ওপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।[৩]

আয়াতের সঠিক তাফসীর :

৩. সূরা বাকারা-৪

সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াতে মুমিন, মুত্তাকীনদের গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে যে গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে। তার সবগুলোই একজন মুমিনের মধ্যে থাকতে হবে। এসবের প্রত্যেকটি অপরটির জন্য শর্ত ও অবধারিত। সুতরাং, কোনো মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখা, নামাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, জীবনোপকরণ যা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তা থেকে দান করা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআনের প্রতি ঈমান আনা। পূর্ববতী নবীগণের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনা ব্যতিত, মুমিন কখনো মুক্তি পাবে না।[৩]

সুতরাং আমরা খ্রিস্টান ভাইদেরকে বলব, আপনাদের মধ্যে কি এসব গুণাবলীগুলো পাওয়া যাবে? অবশ্যই না। তাহলে কীভাবে আপনারা এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন?

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে পূর্ববর্তী অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের প্রতি শুধুমাত্র ঈমান আনতে বলেছেন। আমল করতে বলেন নি। আর ঈমান রাখার ক্ষেত্রেও স্বয়ং কুরআন শর্ত করেছে যে ঐ সমস্ত গ্রন্থ অপরিবর্তিত থাকতে হবে। অথচ আপনাদের তাওরাত, ইঞ্জিল ও বাইবেল যে পরিবর্তন হয়েছে স্বয়ং কুরআন তা নিশ্চিত করেছে। সুতরাং আপনাদের দাবি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান যোগ্য। আর আপনদের দাবি অনুযায়ী যেহেতু কুরআনের প্রতি ঈমান রাখতে হবে, তাই কুরআন আপনাদেরকেও মানতে হবে। কারণ তা কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত হয়ে থাকার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা আপনদেরকে মানার তৌফিক দান করুন। আমিন ।

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে :

খ্রিস্টানরা এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আপনার ওপর ও আপনার পুর্ববর্তী কিতাবের ওপর।" এর দ্বারা বুঝাতে চায় যে, তাওরাত ও ইঞ্জিল তো হলো

৩. তফসীরে কুরতবী ১/১৬২-১৬৩

কুরআনের পূর্বের কিতাব, তাই সেগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের উপর ঈমান আনতে হবে।

১নং উত্তরঃ

খ্রিস্টান প্রচারকদেরকে বলবো, এটা তো হলো আপনাদের মনগড়া ব্যাখ্যা। কুরআনে এ কথা কোথাও নেই যে, কুরআন ও পূর্ববর্তী কিতাবের মধ্যে পার্থক্য নেই। প্রথমে কুরআন দ্বারা প্রমাণ দিন, এর পর আলোচনায় বসুন। আপনি নিজেও গোমরাহীর সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন, অন্যকেও পথভ্রষ্ট করছেন। আমি খ্রিস্টান ভাইদের জিজ্ঞাসা করবো, আপনারা কি নিজেরা এই আয়াতের ওপর আমল করছেন? যদি বলেন হ্যাঁ, তাহলে চার্চগুলোতে কুরআন শরীফ রাখেন না কেন? নামাজ পড়েন না কেন? রোজা রাখেন না কেন? আগে আপনরা প্রতিটি চার্চে কুরআন শরীফ রাখুন। কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করুন। তা নিজেরা পড়ুন ও আমল করুন। এর পর আমাদের সাথে দেখা করুন।

২নং উত্তরঃ

দ্বিতীয়ত, আপনারা বলেছেন, উভয়ের ওপর ঈমান আনতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো আপনারা কি ঈমান এনেছেন? যদি বলেন হ্যাঁ, তাহলে বলব, প্রথমে আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন। কারণ আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম"[৩]। "ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।"[৩]

অতএব, খ্রিস্টধর্মও আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এই আয়াতের ওপর আমল করতে হলে আপনাকে খ্রিস্টধর্ম ছাড়তে হবে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। প্রথমে, খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করুন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুন। এরপর মুসলমানদেরকে এই আয়াতের দাওয়াত দিন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমিন।

৩নং উত্তর

---

৩. আল-ইমরান:১৯

৩. আল-ইমরান:৮৫

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাস করতে বলেছেন। তাই, আমরা বিশ্বাস করি। আল্লাহ তা'আলা যেই তাওরাত ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন সেটাকে মানি। প্রচলিত বাইবেলের অংশগুলোকে নয়। বর্তমান তাওরাত বা ইঞ্জিলকে আল্লাহ তা'আলা অনুসরণ করতে বলেননি। তাই, আমরা তাওরাত-ইঞ্জিল অনুসরণ করি না। কুরআনে কোথাও নেই যে তাওরাত বা ইঞ্জিলের অনুসরণ করতে হবে।

খ্রিস্টান ভাইয়েরা সর্বদা নিজ মতবাদকে সত্য সাব্যস্ত করার জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বন করে। চাই কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করে হোক বা মনগড়া ব্যাখ্যা করে হোক বা অন্য কোনো পন্থায় উদ্দেশ্য হাসিল করে হোক। তারা মিথ্যার মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করাকে পুণ্যকর্ম বলে মনে করে।

বাইবেলেই এর প্রমাণ দেখুন। প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পৌল বলেন-"আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁর গৌরব উপচিয়া পড়ে তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?[৩] ফলে, তারা ধর্ম প্রচারে মিথ্যাচার ও প্রতারণাকে মূলনীতিতে পরিণত করেছে।

উপরোক্ত বক্তব্য যখন বুঝলাম, এবার আসুন আসল কথায় আসি। খ্রিস্টান ভাইয়েরা সূরা বাকারার প্রথম ৫ টি আয়াত থেকে যে বিষয়টি দাবি করেছে তা সম্পূর্ণ মনগড়া ও মিথ্যাচার। আর আয়াতের সাথে কোন ধরণের সম্পৃক্তই নেই। আয়াতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কিতাব কুরআনের পার্থক্য নেই। এ ধরনের বক্তব্য এখানে নেই। বরং এখানে প্রথমে কুরআনে যে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই তা বলা হয়েছে এবং মুত্তাকীর পরিচয় দেয়া হয়েছে। এভাবে-"মুত্তাকী-পরহেযগার তারা যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে এবং আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত রিযিক থেকে দান করে। আর বিশ্বাস করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর- ওপর অবতীর্ণ কিতাবের ওপর এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ওপর।"

এই আয়াতে 'পার্থক্য' কথার উল্লেখ নেই। এখনকার বাস্তবতায় অনেক পার্থক্য। নিম্নে কিছু পার্থক্য পেশ করছি।

---

৩. রোমীয়- ৩ঃ৭

কুরআন ও পূর্ববতী কিতাবসমূহের পার্থক্য

কুরআন ও পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তার কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে দেয়া হল।

ক্রমিক নং	কুরআন	পূর্ববর্তী কিতাব
১	আর কুরআন নাজিল হয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য।[১]	পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাত, ইঞ্জিল নাজিল হয়েছে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য।[২]
২	আল্লাহ তা'আলা নিজে কুরআন সংরক্ষণের ঘোষণা দিয়েছেন।[৩]	পূর্বের কিতাব গুলো সংরক্ষণের ঘোষণা আল্লাহ তা'আলা দেন নি।
৩	৩. কুরআনের মধ্যে রয়েছে সব সমস্যার সমাধান।	কিন্তু পূর্ববর্তী কিতাব সমূহতে কোন সমস্যার সমাধান নেই।
৪	কুরআন রহিত হয়নি এবং হবেও না। কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে।	পূর্ববর্তী কিতাব সমূহ রহিত হয়ে গেছে। কুরআন আসার পর তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।
৫	কুরআন নাযিল হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ মুখস্থ করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত মুখস্থ করবে।	পক্ষান্তরে, তাওরাত ইঞ্জিল কেউ মুখস্থ করতে পারেননি এবং ভবিষ্যতে কেউ পারবেনা। ফলে তা সংরক্ষণ করা যাইনি।
৬	কুরআন প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের সর্বস্থানে পাঠ হচ্ছে। তেলাওয়াতের মাধ্যমে, নামাজের মধ্যে, তাহাজ্জুদে এবং তারাবীতে সকল যুগেই।	পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ পাঠ হয় না। হলেও শুধু রবিবারে তাও আবার নির্বাচিত অংশ।
৭	কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা লিখিত হয় ও পঠিত হয়। অদ্যবধি এভাবেই চলে আসছে।	পক্ষান্তরে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এমনটি নয়। এগুলো অনেক পরে লেখা হয়েছে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে লিখেছে যা অধিকাংশই মনগড়া।
৮	কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকে সকল মুমিনের পাঠ্য বই। ফলে প্রতিদিন প্রত্যেকে নিজের নামাজে, জামাতে ও সংঘবদ্ধ ভাবে কুরআন শিক্ষা ও শিখানো হয়।	পক্ষান্তরে, অন্যান্য কিতাব সমূহ শুধুমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গগণ অধ্যয়ন করতে পারতো সাধারণ মানুষের জন্য অনুমতি ছিলো না।
৯	৯. চ্যালেঞ্জ, একমাত্র কুরআনই নির্ভুল এবং সঠিক। সকল ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের একমাত্র কুরআনই নির্ভুলতার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছে।	যা অন্য কোনো ধর্মীয়গ্রন্থ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে অন্যান্য কিতাব সমূহে ইহুদি খ্রিস্টানরা তিন ভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। (১) ভুলে যাওয়া (২) বিকৃত করা[৪] (৩) জাল কথা ও বই সংযোজন করা।[৫]

প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে কুরআন বাইবেলের তিন প্রকার বিকৃতির কথা ঘোষণা করেছে। প্রায় ১২/১৩ শত বৎসর যাবত ইহুদি-খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করেন যে, তাওরাত-ইঞ্জিল বিশুদ্ধভাবে বিদ্যমান। কিন্তু বিগত প্রায় ২০০ বৎসরে পাশ্চাত্যের ইহুদী-খ্রিস্টান গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন যে-কুরআনের ঘোষণাই সত্য। প্রচলিত বাইবেলে হাজার হাজার বিকৃতি ও জালিয়াতি বিদ্যমান। আশা করি, পাঠকদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

১. সূরা বাকারা- ১৮৫
২. মথি-১৫:২৪, ১০:০৫
৩. মায়েদা : ১৩, ১৪ ও ৪১।
৪. বাকারা-৭৯

এই আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, কুরআন ও পূর্ববর্তী কিতাব গুলোর মধ্যে পার্থক্য হলো আকাশ ও জমির ব্যবধানের ন্যায়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে খ্রিস্টানদের কুরআনের অপব্যাখ্যা থেকে হেফাজত করুন। এবং খ্রিস্টান ভাইদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমিন।

পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে

খ্রিস্টানদের দাবি: পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে ও মানতে হবে। নবীগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত; তাদেরকে ওহী দেয়া হয়েছে।

তাদের দলিল :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا .

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তা'আলার ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তার রাসূল ও তার কিতাবের ওপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসূলের ওপর এবং সে সমস্ত কিতাবের ওপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতঃপূর্বে। যে আল্লাহ তা'আলার ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, রাসূলগণের ওপর এবং কিয়ামত দিনের ওপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে। [১]

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

এই আয়াতের মধ্যে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ঈমান আনতে বলা হয়েছে; মানতে বলা হয়নি।

এ আয়াতের মধ্যে " فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا দ্বারা মুসলমানগণ উদ্দেশ্য"- এ কথা কোনো তাফসীর গ্রন্থে নেই। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি যে, আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল এবং পরকালকে অস্বীকার করবে সে সঠিক পথ থেকে বের হয়ে যাবে এবং সঠিক পথ থেকে বহুদূরে চলে যাবে।[২]

---

১. সূরা নিসা-১৩৬

২. ইবনে কাসীর ১/৫৩৬

সুতরাং, যেহেতু খ্রিস্টানরা কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানে না বরং অস্বীকার করে তাই, সঠিক পথ থেকে বহু দূরে রয়েছে।

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে :

খ্রিস্টানগণ এই আয়াত দ্বারা বুঝাতে চায় যে, এখানে আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণকে রাসূল ও পূর্ববর্তী কিতাবের উপর ঈমান আনতে বলেছেন। তাই, মুসলমানদেরকে সেই সকল নবী ও তাদের কিতাবকে বিশ্বাস করতে হবে এবং মানতে হবে। এখানে শেষে ضَلَالًا بَعِيدًদ্বারা মুসলমাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করে। তারা বলে, যারা তাওরাত-ইঞ্জিল না মানে তারা ভীষণ পথভ্রষ্ট। অর্থাৎ তাওরাত, জবুর এবং ইঞ্জিলের ওপর ঈমান আনতে হবে।

১নং উত্তরঃ

খ্রিস্টান ভাইয়ের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা, "আপনি কি উপরের কিতাবগুলো মানেন? আল্লাহ তা'আলা প্রথমে কুরআনের কথা বলেছেন। আপনি কি কুরআনের কথা মানেন? যদি বলেন, হ্যাঁ মানি। তাহলে নামায পড়েন না কেন? রোজা রাখেন না কেন? দাড়ি রাখেন না কেন? এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমেই আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনার কথা। একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেন? আপনারাতো যীশুর উপর বিশ্বাস রাখেন। আর কুরআনে তো কোথাও যীশুকে মানার কথা নেই। তা হলে মানেন কেন?"

২নং উত্তর

কুরআনের উক্ত আয়াতে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। তাই, আমরা বিশ্বাস করি। তবে ঐ তাওরাতকে বিশ্বাস করি, যা মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। ঐ ইঞ্জিলের উপর বিশ্বাস রাখি, যা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে, বর্তমান মানব রচিত ভুলে ভরা স্ববিরোধে ভরপুর বাইবেল ও প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিলের ওপর বিশ্বাস করি না।

৩নং উত্তর

আপনারা উপরিউক্ত আয়াতের । فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা তাওরাত-ইঞ্জিল মানে না তারা পথভ্রষ্ট। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আপনারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট। কারণ আপনারা তাওরাত ইঞ্জিলের নির্দেশ মানেন না। এই কিতাবগুলো বলে- শিরকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আপনারা কি এই নির্দেশগুলো মানেন? পালন করেন? মানেন না। ফলে আপনারাই পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমিন।

৪নং উত্তর

এই আয়াতে পূর্বের কিতাবকে মানার কথা বলা হয়নি। বরং বিশ্বাস করার কথা বলা কয়েছে। তাই আমরা তাদেরকে বিশ্বাস করি; মানি না। একটি উদহারণ দিলে বিষয়টি সহজে বুঝে আসবে। যেমন, আমাদের দেশের বর্তমান সরকার প্রধান হলেন শেখ হাসিনা। পূর্বে ছিলেন এরশাদ, খালেদা জিয়া। এখন আমরা কাকে মানবো? অবশ্যই শেখ হাসিনাকে। কারণ তিনি বর্তমান সরকার প্রধান। তবে এরশাদ, খালেদাকে বিশ্বাস করি তারা এক সময় সরকার প্রধান ছিলেন। এখন নেই। তদ্রুপ আমরা বর্তমান নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামকে মানি। পুর্বের নবীদের বিশ্বাস করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্বাস করতে মানার জন্য নয়। তেমনি ভাবে আমরা বর্তমানের বাংলাদেশের সংবিধানকে মানি। কিন্তু পাকিস্তানের সংবিধানকে মানব না। তবে বিশ্বাস করি পাকিস্তানের সংবিধান ছিল। ঠিক আমরা বর্তমান আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধান কুরআনকে মানি। পূর্বের সংবিধান কিতাব গুলোকে মানি না। তবে বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্বে তাওরাত- ইঞ্জিল ইত্যাদি নামে আরো কিছু কিতাব

পাঠিয়েছিলেন। বর্তমান তাওরাত- ইঞ্জিল নয়, কারণ এগুলো মানব রচিত গ্রন্থ। এগুলো মানি না। এসব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

প্রত্যেক যুগের উম্মতের অবস্থা অনুপাতে তাদের ধর্মের শরিয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। যার ফলে একই কাজে এক নবীর ধর্মের শরিয়ত অন্য নবীর ধর্ম থেকে ভিন্ন। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসতে হলে শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। অন্যান্য নবীগণের অনুসরণ করতে বলা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন- "তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।"[৩]

ভাইটি আমার! আল্লাহ তা'আলা কে পাওয়ার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিয়া সাল্লামের অনুসরণ করতে হবে। আপনারা কার অনুসরণ করেন? ঈসা আ.-এরও অনুসরণ করেন না। তাহলে কার অনুসরণ করেন? অবশ্যই শয়তানের।

৫নং উত্তরঃ

এখানে আয়াতের শেষে খ্রিস্টানদের ভীষণ পথভ্রষ্টতার কথা বলা হয়েছে। কারণ তারা এক আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করে। ঈসা (আ) কে আল্লাহ তা'আলার ছেলে বলে শিরক করছে। কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না মানার কারণে তারা ভীষণ পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এই ভ্রষ্টতা হল খ্রিস্টানদের জন্য, মুসলমানদের জন্য নয়। আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টান ভাইদেরকে হেদায়াত দান করুন। খ্রিস্টান ভাইদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি। আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন, ভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে যাবেন। চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে হেদায়েত দান করুন। আমিন

---

৩. আলইমরান- ৩১

পূর্ববর্তী কিতাবে রয়েছে হেদায়াত ও নূর

খ্রিস্টানদের দাবি:

পূর্ববর্তী কিতাব কোরআনের অনুরূপ। কারণ তাতে আছে হেদয়াত ও নূর।

খ্রিস্টনদের দলিল:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ .

আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে।[৩]

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.

আমি তাদের পেছনে মরিয়ম তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়ন করে, পথ প্রদর্শন করে এবং এটি মুত্তাকীদের জন্যে হেদায়াত ও উপদেশ বাণী।[৩]

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

রমযানের ব্যাপারে হুকুম দেয়া হয়েছে, "আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।[৩]

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

এই আয়াতের মধ্যে " وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُور. " অর্থাৎ আমি ঈসা ইবনে মরিয়মকে দান করেছি ইঞ্জিল, তাতে রয়েছে হেদায়েত এবং নূর। ইমাম রাজী রাহ: তাফসীরে কাবীরে লিখেছেন হেদায়াত এই অর্থে যে ইঞ্জিল কিতাবে আল্লাহ তা'আলা একাত্ববাদের ও পবিত্রতার দলিল প্রমাণ বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে শিরক থেকে পবিত্রতা অর্জনের পথ নির্দেশ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী, সন্তান, হওয়া থেকে মুক্ত এবং তাতে আছে আল্লাহ তা'আলার নবীর নবুওয়াত এবং পরকালের কথা।

আর ইঞ্জিলে নূর রয়েছে, এর তাৎপর্য হল- তাতে শরীয়তের বিধি নিষেধ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৩]

যে ভাবে অপব্যাখ্যা করে:

এই আয়াতে খ্রিস্টানরা সাধারণ মুসলমাদেরকে বুঝাতে চায় যে, কুরআনের মতো বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যেও হেদায়াত ও নূর আছে। তাই এই কিতাব গুলোকেও মানতে হবে।

উক্ত আয়াতগুলির দ্বারা আরো বুঝাতে চায় যে, পূর্ববর্তী কিতাব কোরানের অনুরূপ যা কোরানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই নাজাতের একমাত্র পথ আপনাকেই বেছে নিতে হবে। আর এটাও জেনে রাখতে হবে নাজাত দাতা ঈসা ছাড়া পাপ মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই। আর ইঞ্জিল শরিফ তারই মুখসৃত বাণী।[৩]

উত্তর:

হ্যাঁ তাওরাত ইঞ্জিলে হেদায়াত ও নূর আছে তা অস্বীকার করি না। তবে বর্তমান প্রচলিত তাওরাত ইঞ্জিল ও বাইবেলে হেদায়াত ও নূর নেই। কারণ এগুলোতে রয়েছে অন্ধকার। কারণ আসল তাওরাত ইঞ্জিল বর্তমানে কোথাও

---

৩. সূরা মায়েদা-৪৪

৩. সূরা মায়েদা-৪৬

৩. সূরা মায়েদা-৪৮

৩. আত-তফসীরুল কাবির ৪/ ৩৭০

৩. গুনাহ্গারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ-১৫

নেই। আপনারা ঈসা আ. কে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার পর থেকে ৩০০ বছরের মধ্যেকার কোনো ইঞ্জিল দেখাতে পারবেন না। আপনাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও পারে নি।

هدًا আকিদাসমূহের হেদায়াত ছিল। আর نور আমলের আলো ছিল।

আল্লাহ তা'আলা যেই তাওরাত, ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছিলেন সেটিতে আছে হেদায়াত ও নূর। সেটির উপর বিশ্বাস করতে হবে। বর্তমানে আমরা যেই তাওরাত ও ইঞ্জিল দেখি, সেগুলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ইঞ্জিল নয়। বরং মানব রচিত একটি গ্রন্থ যা বিভিন্ন লেখক দ্বারা লিখিত। কারণ বর্তমান তাওরাত ইঞ্জিলগুলো বাংলা ভাষায়। আল্লাহ তা'আলা বাংলা ভষায় তাওরাত ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেন নি। এছাড়া কোনো ব্যক্তির জীবনী আল্লাহ তা'আলার কালাম হতে পারে না। কোনো ব্যক্তির লেখা চিঠি পত্র আল্লাহ তা'আলার কালাম হতে পারে না। কর্তমান ইঞ্জিলের শুরুতেই লিখা আছে ঈসা মসীহের জীবনী, আর কারো জীবনী আল্লাহ তা'আলারকালাম হতে পারে না। প্রচলিত ইঞ্জিলে ২৭টি অধ্যায় আছে। এর মধ্যে ১৪টিই হলো সেন্ট পৌল নামক এক ইহুদী ব্যক্তির লিখা বিভিন্ন জাতির নিকট পাঠানো চিঠি। এই মানবরচিত পত্রে হেদায়াত ও নূর থাকে কীভাবে? এটা একেবারেই অসম্ভব।

আমরা খ্রিস্টানদেরকে জিজ্ঞাসা করবো, আপনি সেই হিব্রু ভাষার তাওরাত নিয়ে আসুন এবং তাতে হেদায়াত ও নূর তালাশ করুন। খ্রিস্টানদেরকে আরো বলতে চাই, ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়ে ছিল সুরয়ানী ভাষায়। তাই আপনারা আমাদের সামনে একটি মাত্র সুরয়ানী ভাষার ইঞ্জিল পেশ করুন। যা ইসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আপনারা কক্ষনও পারবে না।

খ্রিস্টানরা কুরআনের সাথে বাইবেল বা প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিলকে তুলনা করে। এটা একটি বড় ধরনের প্রতারণা। পক্ষান্তরে কুরআনের সাথে কোনো কিতাবের তুলনাই হতে পারে না।

খ্রিস্টান পন্ডিতগণ এ কথা ভালো ভাবেই জানে যে বর্তমান বাইবেলে ৫০ হাজারেরও অধিক ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। খ্রিস্টান পন্ডিতরা শত-শত বৎসর চেষ্টা করেও যখন কুরআনের একটি নোক্বতা বা বিন্দুও পরিবর্তন করতে পারেনি, তখন তারা তাদের ধর্মটিকে কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে সঠিক বানাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

পূর্বের কিতাবে হেদায়াত ও নূর ছিল এখন বাইবেলে নেই। আয়াতের শেষে বিষয়গুলো ছিল কারণ কুরআন শুরুতেই বলেছে "এই কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই।"[১]

পক্ষান্তরে বাইবেলের রয়েছে অসংখ্য ভুল। এখানে বাইবেল থেকে কিছু ভুল তুলে ধরা হলো, এ থেকে প্রমাণিত হবে, এই ভুলে ভরা গ্রন্থে কীভাবে হেদায়াত ও নূর থাকতে পারে।

বাইবেলে ভুল

১. কেরী বাইবেলের ভূমিকায় লেখা আছে, "এই কিতাব বহুবার সংশোধিত করা হয়েছে। দুই বাংলার বাইবেল সোসাইটির নীতি নির্ধারকগণ মনে করেন, আরো কয়েকবার সংস্কার করার প্রয়োজন আছে।"[২]

প্রিয় পাঠক! বলুন তো আল্লাহর কালামের কি সংস্করণ হতে পারে? না হতে পারে না। আর বাইবেলে বহু বার সংস্করণ হয়েছে। ভুল সংশোধন করেছে, তাহলে এটা আবার আল্লাহর কালাম হয় কীভাবে? আর ভুল না থাকলে সংশোধনের প্রয়োজন কেন? এর দ্বারা বুঝা যায়, এর মধ্যে কী পরিমাণ ভুল রয়েছে। আর এই ভুলে ভরা কিতাবে কী ভাবে হেদায়াত ও নূর থাকতে পারে?

---

১. বাকারা-২

২. কেরী বাইবেলের ভূমিকা

২. সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারান্দার উচ্চতা বর্ণনায় ভুল

২ বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ বা আল-মাসজিদুল আকসার (বাইবেলের ভাষায়: সলোমনের মন্দিরের) বর্ণনায় বলা হয়েছে: "আর গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও একশত বিংশতি হস্ত উচ্চ হইল।"

"১২০ হাত উচ্চ" কথাটি নিখাদ ভুল। ১ রাজাবলির ৬ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, শলোমনের নির্মিত মন্দিরের উচ্চতা ছিল ত্রিশ হস্ত। তাহলে বারান্দা কীভাবে ১২০ হাত উঁচু হবে?

আদম ক্লার্ক তার ভাষ্যগ্রন্থে ২বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের ভুল স্বীকার করেছেন। এজন্য সিরীয় (সুরিয়ানী) ভাষায় ও আরবি ভাষায় অনুবাদে অনুবাদকগণ ১২০ সংখ্যাকে বিকৃত করেছেন। তারা "এক শত" কথাটি ফেলে দিয়ে বলেছেন: "বিশ হাত উচ্চ।"

১৮৪৪ সালের আরবি অনুবাদে মূল হিব্রু বাইবেলের এ ভুল "সংশোধন"(!) করে লেখা হয়েছে: "আর গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও বিংশতি হস্ত উচ্চ হইল।"[৩]

৩. অবিয় ও যারবিয়ামের সৈন্যসংখ্যা বর্ণনায় ভুল।

২ বংশাবলির ১৩ অধ্যায়ে ৩ ও ১৭ শ্লোকে বলা হয়েছে:"(৩) অবিয় চারি লক্ষ মনোনীত যুদ্ধাবীরের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন এবং যারবিয়াম আট লক্ষ বলবান বীরের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিলেন।...(১৭) আর অবিয় ও তাঁহার লোকেরা মহাসংহারে উহাদিগকে সংহার করিলেন; বস্তুত ইস্রায়েলের পাঁচ লক্ষ মনোনীত লোক মারা পড়িল।"

উপরের শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি সবই ভুল। বাইবেল ব্যাখ্যাকারগণ তা স্বীকার করেছেন। যে যুগের ছোট্ট দুটি 'গোত্র রাজ্য' যিহূদা ও ইস্রায়েলের জন্য উপরের সংখ্যাগুলি অস্বাভাবিক ও অবাস্তব। এ কারণে ল্যাটিন অনুবাদের অধিকাংশ কপিতে 'লক্ষ'-কে হাজার নামিয়ে আনা হয়েছে, অর্থাৎ প্রথম স্থানে 'চারি লক্ষ' পাল্টিয়ে 'চল্লিশ হাজার', দ্বিতীয় স্থানে 'আট লক্ষ' পাল্টিয়ে 'আশি হাজার' ও তৃতীয় স্থানে 'পাঁচ লক্ষ' পল্টিয়ে 'পঞ্চাশ হাজার' করা হয়েছে। বাইবেলের ব্যাখ্যাকারগণ এই বিকৃতি ও পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছেন। হর্ন ও আদম ক্লার্ক এ "সংশোধন"(!) সমর্থন করেছেন। আদম ক্লার্ক অনেক স্থানেই বারংবার সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, বাইবেলের ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকগুলিতে বিকৃতি সাধিত হয়েছে।

৪. ফল ভোজন ও মানুষের আয়ু বিষয়ক ভুল

আদিপুস্তকের ২য় অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমার আত্মা মানুষের মধ্যে সর্বদা অবস্থান করিবে না; কারণ সেও তো বংশমাত্র; পরন্তু তার সময় এক শত বিংশতি বৎসর হইবে।"

"মানুষের আয়ু ১২০ বৎসর হবে" -এই কথাটি ভুল। কারণ, পূর্ববর্তী যুগের মানুষের বয়স আরো অনেক দীর্ঘ ছিল। আদিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ১-৩১ শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে আদম ৯৩০ বৎসর জীবিত ছিলেন। অনুরূপ শিস (শথ) ৯১২ বৎসর, ইনোশ ৯০৩ বৎসর, কৈনন ৯১০ বৎসর, মহললেল ৮৯৫ বৎসর, যেরদ ৯৬২ বৎসর, হানোক (ইদরীস আ.) ৩৬৫ বৎসর, মথূশেলহ ৯৬৯ বৎসর, লেমন ৭৭৭ বৎসর পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। নোহ (নূহ) ৯৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। শেম (সাম) ৬০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। অর্ফক্ষদ ৩৩৮বৎসর আয়ু লাভ করেন। এভাবে অন্যান্যরা দীর্ঘ জীবন লাভ বরেছিলেন। আর বর্তমান যুগে ৭০ বা ৮০ বৎসর আয়ু পাবার ঘটনাও কম ঘটে। এভাবে প্রমাণিত যে, মানুষের আয়ু ১২০ বৎসর বলে নির্ধারণ করা ভুল।

৫. যিশুর বংশতালিকায় পুরুষ গণনায় ভুল

মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১-১৭ শ্লোকে যীশুর বংশতালিকা বর্ণনা করা হয়েছে। ১৭ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "এইরূপে আব্রাহাম অবধি দায়ূদ পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ অবধি বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; এবং বাবিলে নির্বাসন অবধি খ্রিস্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।"

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যীশুর বংশতালিকা তিন অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশে ১৪ পুরুষ রয়েছে এবং যীশু থেকে আব্রাহাম পর্যন্ত ৪২ পুরুষ। এ কথাটি সুস্পষ্ট ভুল। মথির ১:১-১৭ ও বংশ তালিকায় যীশু থেকে আব্রাহাম পর্যন্ত ৪২ পুরুষ নয়, বরং ৪১ পুরুষের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম অংশ: ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে দায়ূদ আলাইহি ওয়াসাল্লামের

৩. সংক্ষিপ্ত ইজহারুল হক-৬০

পর্যন্ত ১৪ পুরুষ, দ্বিতীয় অংশ সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে যিকনিয় পর্যন্ত ১৪ পুরুষ, তৃতীয় অংশ শল্টীয়েল থেকে এবং যীশু পর্যন্ত মাত্র ১৩ পুরুষ রয়েছেন।

তৃতীয় খ্রিস্টীয় শতকে বোরফেরী এই বিষয়টি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন, কিন্তু এর কোনো সঠিক সমাধান কেউ দিতে পারেন নি।

৬. মিসর পরিত্যাগের সময় ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা বর্ণনায় ভুল:

গণনা পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ৪৪-৪৭ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে: "(৪৪) এই সকল লোক মোশি ও হারোণ... কর্তৃক গণিত হইল। (৪৫) স্ব-স্ব পিতৃকুলানুসারে ইস্রায়েল সন্তানগণ, অর্থাৎ বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য (৪৬) সমস্ত পুরুষ গণিত হইলে লোকদের সংখ্যা ছয় লক্ষ তিন সহস্র পাঁচ শত পঞ্চাশ হইল। (৪৭) আলেবীয়ের আপন পিতৃবংশানুসারে তাহদিগের মধ্যে গণিত হইল না।"

এ শ্লোকগুলি থকে জানা যায় যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন মোশির সাথে মিশর ত্যাগ করে তখন তাদের ২০ বৎসরের অধিক বয়সের যুদ্ধে সক্ষম পুরুষদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষের অধিক (৬,০৩,৫৫০)। লেবীর বংশের সকল নারী, লেবীয় বংশের সকল পুরুষ, অন্যান্য সকল বংশের সকল নারী এবং সকল বংশের ২০ বৎসরের কম বয়স্ক সকল যুবক ও কিশোর পুরুষ বাদ দিয়েই ছিল এই সংখ্যা।

চার শ্রেণীর মানুষ এই গণনা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে: ১. লেবীয় বংশের সকল নারী, ২. লেবীয় বংশের সকল পুরুষ, ৩. অন্যান্য সকল বংশের সকল নারী এবং ৪. সকল বংশের ২০ বৎসরের কম বয়স্ক সকল যুবক ও কিশোর পুরুষ বাদ দিয়েই ছিল এই সংখ্যা।

তাহলে যদি এই চার প্রকারের নারী, পুরুষ ও যুবক-কিশোরদের গণনায় ধরা হয় তাহলে মিশর ত্যাগকালে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে কমপক্ষে ২৫ লক্ষ। আর এই তথ্য কোনোমতেই সঠিক হতে পারে না। কারণ:

প্রথমতঃ আদিপুস্তক ৪৬:২৭, যাত্রাপুস্তক ১:৫, দ্বিতীয় বিবরণ ১০:২২-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন মিশরে প্রবেশ করে তখন তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন।

দ্বিতীয়তঃ ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিশরে অবস্থান করেছিলেন সর্বমোট ২১৫ বৎসর। এর বেশি তারা অবস্থান করেন নি।

তৃতীয়তঃ যাত্রাপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ১৫-২২ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মিশর ত্যাগের ৮০ বৎসর পূর্ব থেকে তাদের সকল পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হতো এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হতো।

এ তিনটি বিষয়ের আলোকে যে কোনো সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ নিশ্চিত হবেন যে, মিশর ত্যাগের সময় ইস্রায়েল সন্তানদের যে সংখ্যা (৬,০৩,৫৫০) উল্লেখ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ভুল।

আমরা যদি পুত্র সন্তান হত্যার বিষয়টি একেবারে বাদ দেই এবং মনে করি যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ মিশরে অবস্থানকালে তাদের জনসংখ্যা এত বেশি বৃদ্ধি পেতো যে, প্রতি ২৫ বৎসরে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেত, তাহলেও তাদের সর্বমোট জনসংখ্যা ২১৫ বৎসরে ৭০ থেকে ৩৬০০০ (ছত্রিশ হাজার)-ও হতে পারে না। তাহলে সর্বমোট জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ হওয়া লেবীয়গণ বাদে মোট পুরুষ যোদ্ধার সংখ্যা ছয় লক্ষ হওয়া কীভাবে সম্ভব! এর সাথে যদি শেষ ৮০ বছরের পুরুষ হত্যার বিষয় যোগ করা হয় তাহলে বিষয়টি আরো অসম্ভব ও অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনু খালদুন(৮০৮হি/১৪০৫খৃ) তার ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় বাইবেলে উল্লিখিত এ সংখ্যা অবাস্তব বলে মতপ্রকাশ করেছেন। কারণ মূসা ও ইস্রায়েল (ইয়াকূব)-এর মধ্যে মাত্র তিনটি বা চারটি প্রজন্ম। যাত্রাপুস্তক ৬:১৬-২০, গণনাপুস্তক ৩:১৭-১৯ ও ১ বংশাবলী ৬:১৮-এর বর্ণনা অনুসারে: মোশির পিতা অম্রাম (ইমরান), তার পিতা কহৎ, তার পিতা লেবি, তার পিতা যাকোব। যাকোব ও মোশির মধ্যে তিন পুরুষ মাত্র। আর মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক কখনোই মানতে পারে না যে, মাত্র চার পুরুষে ৭০ জনের বংশধর ২০-২৫ লক্ষ হতে পারে।

৭. ইস্রায়েল সন্তানদের মিশরে অবস্থান সম্পর্কে ভুল তথ্য:

যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'ইস্রায়েল-সন্তানের চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল মিশরে প্রবেস করিয়াছিল।'

তথ্যটি ভুল। ইস্রায়েল-সন্তানগণ ৪৩০ বৎসর নয় ২১৫ বৎসরকাল মিশরে অবস্থান করেছিল। তবে কেনান দেশে ও মিশরে উভয় স্থানে

ইস্রায়েল সন্তানগণের পূর্বপুরুষ ও তাদের মোট অবস্থানকাল ছিল ৪৩০ বৎসর। কারণ ইব্রাহীম আ.-এর কেনান দেশে প্রবেশ থেকে তাঁর পুত্র ইসহাক আ.-এর জন্ম পর্যন্ত ২৫ বৎসর। ইসহাকের জন্ম থেকে ইয়াকুব আ. বা ইস্রায়েল-এর জন্ম পর্যন্ত ৬০ বৎসর। ইয়াকুব আ.-এর অপর নাম বা প্রসিদ্ধ উপাধি 'ইস্রায়েল' এবং তার বংশধররাই বনী ইসরাঈল বা ইস্রায়েল সন্তানগণ বলে পরিচিত।

ইয়াকুব বা ইস্রায়েল আ. যখন তাঁর বংশধরদের নিয়ে মিশরে প্রবেশ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ১৩০ বৎসর। এভাবে আমরা দেখছি যে, ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশরে প্রবেশ থেকে তাঁর পৌত্র ইয়াকুব আ. মিশরে প্রবেশ পর্যন্ত সময়কাল (২৫+৬০+১৩০=) ২১৫বৎসর।

ইস্রায়েল আ.-এর মিশরে প্রবেশ থেকে মূসা আ.-এর সাথে তাঁর বংশধরদের মিশর ত্যাগ পর্যন্ত সময়কাল ২১৫ বৎসর। এভাবে কেনানে ও মিশরে তাদের মোট অবস্থানকাল (২১৫+২১৫=) ৪৩০ বৎসর।

ইহুদী-খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, হিব্রু বাইবেলের এ তথ্যটি ভুল। তারা বলেন: শমরীয় তাওরাতে এখানে উভয় স্থানের অবস্থান একত্রে বলা হয়েছে এবং এখানে শমরীয় তাওরাতের বক্তব্যই সঠিক।

শমরীয় তাওরাত বা তাওরাতের শমরীয় সংস্করণ অনুসারে যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৪০ পদটি নিম্নরূপ: "ইস্রায়েল সন্তানগণেরা ও তাদের পিতৃগণ কেনান দেশে ও মিশরে চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিল।"

এখানে গ্রীক তাওরাত বা তাওরাতের গ্রীক সংস্করণের ভাষ্য নিম্নরূপ: "কেনান দেশে ও মিশরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ ও তাদের পিতা-পিতামহগণের মোট অবস্থানকাল চার শত ত্রিশ বৎসর।"

খ্রিস্টান গবেষক ও পণ্ডিতগণের নিকট নির্ভরযোগ্য পুস্তক 'মুরশিদুত তালিবীন ইলাল কিতাবিল মুকাদ্দাসিস সামীন' (মহামূল্য পবিত্র বাইবেলের ছাত্রগণের পথ নির্দেশক) নামক গ্রন্থে এভাবেই ইস্রায়েল সন্তানগণের ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াকূব আ.-এর মিশরে আগমন থেকে ঈসা আ.-এর জন্ম পর্যন্ত সময়কাল ১৭০৬ বৎসর। আর ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর পরিত্যাগ পর্যন্ত সময়কাল ১৪৯১ বৎসর। ১৭০৬ থেকে ১৪০৯ বাদ দিলে ২১৫ বৎসর থাকে। এটিই হলো ইয়াকূব আ.-এর মিশর আগমন থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর পরিত্যাগ পর্যন্ত সময়।

এখানে অন্য একটি বিষয় এ সময়কাল নিশ্চিত করে। মূসা আ. ছিলেন ইয়াকূব আ.-এর অধস্তন ৪র্থ পুরুষ। ইয়াকূবের পুত্র লেবি, তার পুত্র কহাৎ, তার পুত্র অম্রাম (ইমরান), তার পুত্র মূসা আ.। এতে বুঝা যায় যে, মিশরে ইস্রায়েল সন্তানগণের অবস্থান ২১৫ বৎসরের বেশি হওয়া অসম্ভব। আর ইহুদী-খ্রিস্টান ঐতিহাসিক, ব্যাখ্যাকার ও গবেষকগণ একমত পোষণ করেছেন যে, ইস্রায়েলীয়গণ ২১৫ বৎসর মিশরে অবস্থান করেন। তাদের মিশরে ৪৩০ বৎসর অবস্থানের যে তথ্য বাইবেলের হিব্রু সংস্করণে দেওয়া হয়েছে তা ভুল বলে তারা একমত হয়েছেন। এজন্য আদম ক্লার্ক বলেন, "সকলেই একমত যে, হিব্রু সংস্করণে যা বলা হয়েছে তার অর্থ অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল।

৮. ক্রুশের ঘটনার বর্ণনায় ভুল:

মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ের ৫০-৫৩ শ্লোক নিম্নরূপ: "(৫০) পরে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া নিজ আত্মসমর্পণ করিলেন। (৫১) আর দেখ, মন্দিরের তিরস্কারিনী উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল, ভূমিকম্প হইল ও শৈল সকল বিদীর্ণ হইল, (৫২) এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল; (৫৩) এবং তাঁহার পুনরুত্থানের পর তাঁহার কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন।"

মন্দিরের তিরস্কারিনী (পর্দা) বিদীর্ণ হওয়ার কথা মার্কের ১৫:৩৮ ও লূকের ২৩:৪৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাকি বিষয়গুলি, অর্থাৎ পাথরগুলি ফেটে যাওয়া, কবরগুলি খুলে যাওয়া, মৃত লাশগুলির বেরিয়ে আসা, যেরুজালেমে প্রবেশ করা, তথাকার অধিবাসীদের সাথে মৃত লাশগুলির দেখা-সাক্ষাত হওয়া ইত্যাদি বিষয় তারা উল্লেখ করেন নি। মথির দাবি অনুসারে এ বিষয়গুলি প্রকাশ্যে সকলেই অবলোকন করেছিলেন। অথচ একমাত্র মথি ছাড়া সে সময়ের অন্য কোনো ঐতিহাসিক এ ঘটনাগুলি লিখলেন না! এমনকি এর পরের যুগের কোনো ঐতিহাসিকও এ বিষয়ে কিছু লিখেননি। তারা ভুলে গিয়েছিলেন বলে দাবি করার কোনো সুযোগ নেই;

কারণ মানুষ সব কিছু ভুললেও এরূপ অস্বাভাবিক অত্যাশ্চর্য ঘটনা কখনো ভুলতে পারে না। বিশেষত লূক ছিলেন আশ্চর্য ও অলৌকিক ঘটনাবলির সংকলনে অত্যন্ত আগ্রহী। এ কথা কীভাবে কল্পনা করা যায় যে সুসমাচার লেখকগণ সকলেই অথবা অধিকাংশই সাধারণ লৌকিক ঘটনা ও অবস্থাদি লিখবেন, অথচ মথি ছাড়া কেউ এ অসাধারণ অলৌকিক ঘটনাগুলি লিখবেন না?

এ কাহিনীটি মিথ্যা। পণ্ডিত নর্টন পবিত্র বাইবেলের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনিও তার পুস্তকে এ কাহিনীটিকে মিথ্যা বলে বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেছেন। এরপর তিনি বলেন, এ কাহিনীটি মিথ্যা। সম্ভবত যেরুজালেমের ধ্বংসের পর থেকে এই ধরনের কিছু গল্প-কাহিনী ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত কেউ একজন মথি লিখিত সুসামাচারের হিব্রু পাণ্ডুলিপির টীকায় তা লিখেছিলেন এবং অনুলিপি লেখক লেখার সময় তা মূল পাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এরপর সেই কপিটিই অনুবাদকের হাতে পড়ে এবং সেভাবেই তিনি অনুবাদ করেন।

পণ্ডিত নর্টনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যেহেতু মথির সুসমাচারের (মূল হিব্রু থেকে প্রথম গ্রীক) অনুবাদক ছিলেন 'রাতের আঁধারে কাঠ-সংগ্রহকারীর মত' বিবেচনাহীন। শুকনো ও ভেজার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা তার ছিল না। এ গ্রন্থের মধ্যে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ যা কিছু পেয়েছেন সবই অনুবাদ করেছেন। এইরূপ একজনের অনুবাদ ও সম্পাদনার উপরে কি নির্ভর করা যায়? কখনোই না।

আপনাদের দাবি হল যেই কিতাবে কোনো ভুল নেই সেটা হল ইঞ্জিল। আর এতোগুলো ভুল ধরা পড়লো! এতে বুঝা গেল এই ভুলে ভরা গ্রন্থটি আল্লাহ তা'আলার কালাম নয় বা আসমানী কিতাবও নয়। এটা প্রকৃত ইঞ্জিল হতেই পারে না। তাহলে এটা কি? অবশ্যই মানবরচিত একটি গ্রন্থ। আমরা বুঝি বা জানি কোনো জমির মালিকানা দাবি করতে হলে তার কাছে সেই জমির দলিল থাকতে হয়, দলিলে কোনো ধরনের ভুল ধরা পড়লে সেই দলিল গ্রহণযোগ্য হয় না। তা বাতিল বলে সাব্যস্ত হয়। তদ্রুপ ধর্মের যে কোনো ধরনের দলিল হল তার ধর্মীয় গ্রন্থ। সেই ধর্মীয় গ্রন্থটি যদি ভুল হয় তাহলে সেই ধর্মটি ভুল বলে প্রমাণিত হবে, তা অগ্রহণযোগ্য হবে। জমিনের দলিল ভুল থাকার কারণে সেই দলিল গ্রহণযোগ্য হয় না, বাতিল হয়ে যায়। তেমনি বাইবেলে ভুল থাকার কারণে এই গ্রন্থটি বাতিল। যারা এই গ্রন্থ মানে বা বিশ্বাস করে তাদের ধর্মও বাতিল। মোটকথা, খ্রিস্টধর্ম বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য একটি ধর্ম। যার মধ্যে হেদায়ত ও নূর কিছুই নেই।

পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক

খ্রিস্টানদের দাবি:

তাওরাত, ইঞ্জিল ও পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক।

দলিল:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ

আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।[১]

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

এই আয়াতের মধ্যে " مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ " অর্থাৎ যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যতা ঘোষণা করে যে কিতাব হযরত মুসা আ. এবং ঈসা আ. এর উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নাযিল হয়েছিল, উহা আল্লাহ তা'আলার সত্য কিতাব, কুরআন যে সত্য এর প্রমাণ হলো, একটি সত্য বিষয় অপর একটি সত্য বিষয়কে সত্যায়ন করে। কারণ বাতিলধর্ম কখনো সত্যধর্মের সত্যায়ন করে না।

"মুহাইমিনান আলাইহি" এবং পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের বিষয় বস্তুর সংরক্ষণকারী, অর্থ পরিবর্তনশীল কে অপরিবর্তনশীল থেকে পৃথক করে দেয়। অর্থাৎ ঐ সমস্ত কিতাবের মধ্যে ভুল কথা সংযোজন হয়েছে। সেগুলোকে বর্ণনা করে মূল বিষয়কে স্পষ্ট করে দিয়েছে। অতএব পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে যে সব কথা রয়েছে তা যাদি কোরআনের বর্ণনা মুতাবেক হয়, তবে তা হবে সত্য ও সঠিক। আর যদি তা পবিত্র কুরআনের বিরোধী হয়, তবে তা হবে বাতিল।[২]

যে ভাবে অপব্যাখ্যা করে

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরও অন্যান্য কিতাবের আইন বহাল আছে। সেগুলো বাতিল হয়নি। তাই কুরআনের ন্যায় তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর এ সকল আসমানী গ্রন্থ মানতে হবে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণে এগুলি রহিত হয়নি। তারা বলছে কুরআন শরীফ পূর্বের কিতাবকে সমর্থন করছে বাতিল বলছে না। তারা আরো বলে থাকে যে নবীজীকে বলা হয়েছে পুর্বের কিতাবের সংরক্ষক।

এ আলোচনায় খ্রিস্টানদের ২টি দাবি স্পষ্ট হল ১. কুরআন, অন্যান্য আসমানী গ্রন্থগুলোকে বাতিল করেনি। ২. স্বয়ং নবীজী সা. পুর্ববর্তী কিতাবের সংরক্ষক। তাই তাওরাত ইঞ্জিল মানতে হবে।

উত্তর:

এই আয়াতের মাধ্যমে আপনারা যেই তিনটি বিষয় প্রমাণিত করতে চেয়েছেন তা সম্পুর্ণ ভুল ও মনগড়া।

খ্রিস্টানগণ বলেন 'কুরআন অন্যান্য আসমানী গ্রন্থকে বাতিল করেনি।' আমার প্রশ্ন হলো এ কথা কুরআন ও বাইবেলে কোথায় আছে? আগে এই বিষয়টি প্রমাণিত করুন এর পর সামনে চলুন।

দ্বিতীয় এই দাবিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কুরআনের অপব্যাখ্যা। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আসার পর পুর্ববর্তী সকল ধর্ম, আইন-কানুন অন্যান্য নবীগণের অনুকরণ অনুসরণ বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। এখন একমাত্র মুক্তির পথই ইসলাম তথা কুরআনের অনুসরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম।"[১]

অন্যত্র এরশাদ করেছেন–

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।[২]

---

১. সূরা মায়েদা-৪৮

২. মারেফুল কুরআন ইদ্রিস কান্দরভী রহ: ২/৫১৩

১. সূরা আলে ইমরান-১৯

২. সূরা আলে ইমরান-৮৫

এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে মুক্তির জন্য একমাত্র পথ হলো ইসলাম। আর ইসলাম মানতে হলে কুরআনের আইনকেই মানতে হবে। যেহেতু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের আইন কানুন বাতিল হয়ে গেছে। খ্রিস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম , হিন্দুধর্ম কোনোটিই আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আপনি যদি কুরআন মানেন তাহলে এই আয়াত মানেন না কেন? যদি এই আয়াত মানেন তাহলে আপনাদের খ্রিস্টধর্ম বাদ দিয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে হবে। আপনি কি ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত? আপনাকে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্যন করুন। চিরস্থায়ী আগুন থেকে বেঁচে যাবেন।

যেমন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হযরত ওমর রা. একবার তাওরাতের কপি আনলেন। আর বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা তাওরাতের একটি কপি। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা লাল হয়ে যায়। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি মুসা আ.ও জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তার উপায় ছিল না।[১]

এ হাদীস দ্বারা কী বুঝা যায়? হযরত ওমর রা. এর হাতে তাওরাতের কপি দেখে কেনই বা রাসূল সা. রাগান্বিত হলেন? কেন বললেন যদি মুসা আ.ও জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁকেও আমার অনুসরণ করতে হতো? এখানে বিষয়টি স্পষ্ট যে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তাওরাত যাবুর তথা পূর্বের সকল আসমানী কিতাব এর বিধান রহিত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের পর অন্যান্য নবীগণের অনুসরণও রহিত হয়ে গেছে ।[২]

দ্বিতীয়ত: তারা বলে স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুর্ববর্তী কিতাবের সংরক্ষক। এটাও সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অপব্যাখ্যা। কারণ নবী কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো পবিত্র কুরআন সংরক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়নি বরং কুরআনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজেই

১. মেশকাত-৩২

২. এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা বিস্তারিত তাফসিরে আশ্রাফি খন্ড ২, পৃ ৭৯-৯২" মারেফুল কুরআন. পৃ ৩৩৪

নিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় আমি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আমারই।" তাহলে সেই নবীকে কেন পুর্ববর্তী কিতাবের সংরক্ষক বলা হবে? বরং এখানে তারা আয়াতের অপব্যাখ্যা করেছে।

এখানে আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হলো। যখন তাওরাতের অধিকারীরা তাওরাতে এবং ইঞ্জিলের অধিকারীরা ইঞ্জিলে পরিবর্তন সাধন করে, তখন কোরআনই তাদের পরিবর্তনের মুখোশ উম্মোচন করে সংরক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।[৩]

এখানে কুরআনকে সংরক্ষক বলা হয়েছে অথচ খ্রিস্টান মিশনারীরা আয়াতের অপব্যাখ্যা কারে প্রচার করছে যে, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী কিতাবের সংরক্ষক। যা সম্পূর্ণ উদ্ভট ও বানোয়াট। এখানে দুটি বিষয় একটি সমর্থক, অপরটি সংরক্ষক।

প্রথম বিষয়টি হলো সমর্থক. এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বুঝিয়েছেন, এই কুরআন পূর্বের কিতাবকে সমর্থন করে। একথা সত্য কুরআন পূর্বের কিতাবকে সমর্থন করে যেগুলি মুসা আ. ও ঈসা আ. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। বর্তমান বাইবেল বা কিতাবুল মুকাদ্দাস অথবা প্রচলিত তাওরাত ইঞ্জিল এগুলো প্রকৃত তাওরাত ইঞ্জিল নয়। এগুলো মানব রচিত খ্রিস্টানগণ এই আয়াত দ্বারা বর্তমান তাওরাত ইঞ্জিল বুঝাতে চায়।

২য় বিষয়টি হলো; সংরক্ষক। এখানে সংরক্ষণ দ্বারা পূর্ববর্তী কিতাবের হুকুম গুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে। যেগুলো, পূর্বের কিতাবে ছিল, যা কুরআনেও আছে, যেমন শিরক করো না, মূর্তি পুজা করো না, ইত্যাদি।

৩য় বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিধান দ্বারা তাদের বিচার করা। খ্রিস্টানরা বুঝাতে চায় তাওরাত ইঞ্জিল দ্বারা বিচার করতে হবে, তাদের এই ধারণা ভুল। এখানে আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধানের কথা বলেছেন। বাইবেল তাওরাত, ইঞ্জিলের কথা বলেননি।

৪র্থ এই আয়াতেই আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টানদের কুরআন ছাড়া খ্রিস্টানদের খেয়াল খুশির অনুস্বরণ করতে নিষেধ করেছেন।

৩. তাফসিওে মারেফুল কুরআন-৩৩৪

সার কথাঃ- এই আয়াত দ্বারাই আমরা বুঝতে পারলাম খ্রিস্টানদের মনমত ব্যাখ্যা ও তাদের খেয়াল খুশি অনুযায়ী চলা যাবে না। তাদের দলিলই আমাদের দলিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমিন।

কুরআনের মত তাওরাত-ইঞ্জিলও অবিকৃত

খ্রিস্টানদের দাবিঃ

কুরআন বিকৃত হলো না, তাওরাত-ইঞ্জিল বিকৃত হলো কীভাবে?

যে ভাবে অপব্যাখ্যা করেঃ

খ্রিস্টানরা বলেন, কুরআন যেমন লাখ লাখ মানুষ পাঠ করে ফলে বিকৃত করা যায় না। তেমনি তাওরাত ইঞ্জিলও বিকৃত করা সম্ভব ছিল না। কারণ তাওরাত ইঞ্জিলও সারা বিশ্বের মানুষ পাঠ করে।

এসব কথা বলে সাধারণ মানুষকে খ্রিস্টানরা বিভ্রান্তিতে ফেলে। কারণ সাধারণ মুসলমানরা তাদের প্রচলিত তাওরাত- ইঞ্জিলের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারনে ধোঁকায় পড়ছে। তারা মনে করেন এগুলো ওই ইঞ্জিল, যা ঈসা আ. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এই দুর্বলতাকে পুঁজি বানিয়ে মানুষকে ধোঁকা ও প্রতারণা করে মাত্র।

উত্তরঃ

তাদের এই দাবিটি একেবারে ভিত্তিহীন। কারণ আল্লাহ তা'আলা সর্ব শেষ ওহী হিসেবে কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। যা পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রে করেননি। নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ করুন।

(ক) কুরআন মূলত লিখিত বই নয়, বরং অগণিত মানুষের মুখস্থ বই। অবতরণের শুরু থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ তা মুখস্থ করেছেন। প্রতি সপ্তাহে, মাসে ও বৎসরে তাহাজ্জুদের তেলাওয়াতে অগণিত বার খতম করেছেন। সকল যুগেই একই অবস্থা কুরআনের লিখিত রূপ শুধু সহায়ক মাত্র। পক্ষান্তরে তাওরাত-ইঞ্জিল কখনই মুখস্থ করা হয়নি। তা মুখস্থ করা সম্ভবও নয়। খ্রিস্টানভাইদেরকে বলবো পারলে আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থ বাইবেলের একজন হাফিজ নিয়ে আসুন তো দেখি। পারবেন না।

(খ) কুরআন প্রথম অবতরণ থেকেই প্রতিটি মুমিনের প্রতিদিনের পাঠ্য বই। প্রতিদিন নিজের নামাযে, জামাতের নামাজে ও সাধারণ ভাবে প্রত্যেক মুমিন তা তেলাওয়াত করেন বা শুনেন । পক্ষান্তরে তাওরাত-ইঞ্জিল কখনই সাধারণ মানুষের পাঠ্য বই ছিল না। বরং একান্ত কতিপয় ধর্মগুরু বা পুরোহিত বছরে দুই একটি অনুষ্ঠানে বা প্রয়োজনে তা পড়তেন। সাধারণ মানুষের জন্য বাইবেল পাঠ নিষিদ্ধ ছিল। কয়েক'শ বছর আগেও বাইবেল পাঠ করলে আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো।

(গ) মুসা আ. তাওরাতের একটি মাত্র কপি সিন্ধুকের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন, প্রতি সাত বছর পর পর তা পড়ার জন্য। কিন্তু তার মৃত্যুর সাত বছরের মধ্যেই ইহুদিরা তার ধর্ম ত্যগ করে শির্ক কুফরে লিপ্ত হয়ে যায়। এভাবে তাওরাতের পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়। শত শত বছর পরে লোক মুখের প্রচলনে তা লিখা হয়।

(ঘ) যীশুর শিষ্যগণ তার ইঞ্জিল লেখেননি। কারণ, তিনি তাদের বলে ছিলেন যে, তারা জীবিত থাকতেই কেয়ামত হবে।[৩] যীশুর শিষ্যগণ এ কথায় বিশ্বাস করতেন ও ভবিষ্যদ্বাণী করতেন যে, তারা জীবিত থাকতেই কেয়ামত এসে যাবে।[৩] এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইঞ্জিলে আল্লাহ তা'আলার কালাম লিখতে নিষেধ করা হয়েছে: "আর তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এগ্রন্থের ভাব বাণীর বচন সকল মুদ্রাঙ্কিত করিয় না (লিখিয় না); কেননা সময় সন্নিকট। যে অধর্মচারী, সে ইহার পরও অধর্মাচরণ করুক এবং যে কলুষিত সে উহার পরেও কলুষিত হউক; এবং যে ধার্মিক, সে ইহার ধর্মাচারণ করুক ; এবং যে পবিত্র সে ইহার পরেও পবিত্রকৃত হউক।"[৩]

(ঙ) খ্রিস্টান গবেষক পাদ্রীগণ একমত যে, যীশুর তিরোধানের পরে দুইশত বছরের মধ্যে প্রচলিত ইঞ্জিলগুলির কোনো নাম কোথাও পাওয়া যায় না। এ সময়ে খ্রিস্টানগণ অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে বিভিন্ন দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেছেন। কিন্তু কেউ যীশুর ইঞ্জিলের কোনো লিখিত রূপ সংরক্ষণ করেননি। প্রথম শতাব্দির মধ্যেই এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টান চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশপ নিযুক্ত হয়েছে। এসকল বিশপের অনেক চিঠি ও বই এখনো সংরক্ষিত আছে। কিন্তু সেগুলিতে প্রচলিত ইঞ্জিলগুলির কোনো নাম উল্লেখ নেই। দুইশত বছর পর্যন্ত কোনো চার্চে কোনো ইঞ্জিল শরীফ সংরক্ষিত রাখা বা পঠিত হওয়া তো দূরের কথা এগুলির কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। অর্থাৎ মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের লেখা ইঞ্জিল নামে কোনো পুস্তক যে পৃথিবীতে বিদ্যমান একথাটিই দুইশত বছর পর্যন্ত কেউ জানতো না। এটি কোনো বিতর্কিত তথ্য নয়, বরং সকল খ্রিস্টান কর্তৃক স্বীকৃত সত্য ।

---

৩. ১৬:২৭-২৮

৩. ১থিষলনীকীয় ৪:১৫- ১৭। ১করিন্থিয় ১৫/৫১- ৫২

৩. প্রকাশিত বাক্য ২২/১০-১১

(চ) প্রায় তিনশত বছরের মাথায় সমাজে অগণিত ইঞ্জিল শরীফ প্রকাশ পেতে থাকে। পরবর্তী কয়েক'শ বছর যাবত সাধু পলের অনুসারী ত্রিত্ববাদী পাদ্রীগণ এ সকল ইঞ্জিলের মধ্য থেকে তাদের পছন্দসই ইঞ্জিল গুলি বাছাই করে "সঠিক" (canonical) এবং বাকী ইঞ্জিল গুলিকে "সন্দেহজনক" (non canonical/ apocryphal) বলে দাবি করেন। কোনটি সঠিক এবং কোন্‌টি সন্দেহজনক তা নিয়েও তাদের মতভেদের অন্ত নেই। আবার "সঠিক" ইঞ্জিলগুলির পান্ডুলিপিগুলির মধ্যেও অগণিত বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তি বিদ্যমান।

(ছ) খ্রিস্টান প্রচারকগণ বলতে চান যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের ৩০ বৎসর পরে উসমান রা. কুরআন সংকলন করেন। ত্রিশ বছরে বিকৃতির সম্ভাবনা ছিল! যাদের ধর্মগ্রন্থ তিন শত বছর পরে সংকলিত তারা ত্রিশ বৎসর নিয়ে চিন্তা করেন! তাদের এ কথা পুরোটাই মিথ্যা। আমরা আগেই বলেছি, কুরআন মূলত মুখস্থ বই প্রায় সকল মুসলিম তা মুখস্থ রাখতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ই সাহাবিগণ তা লিখেও রাখতেন।

১১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরের বছর ১২ হিজরীতে হযরত আবু বকর রা. কুরআনের লিখিত পান্ডুলিপি সংকলন করে রাখেন। যখন ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, বিভিন্ন দেশের অগণিত মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন তখন নতুন মুসলিমদের জন্য লিখিত কুরআনের প্রয়োজন হতো। অনেকে নিজের ইচ্ছামত কারো মুখে শুনে কুরআন লিখতে শুরু করেন। এতে ভুল পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ জন্য ২৩ হিজরীতে, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের ১২ বছরের মাথায় উসমান রা. খলিফা হওয়ার পরে আবুবকর রা. এর পান্ডুলিপিটিকে কয়েকটি কপি করে মুসলিম বিশ্বে সর্বত্র প্রেরণ ররেন।

(জ) খ্রিস্টানগণ বলেন, হযরত উসমান রা. এর সময় কুরআনের এক কপি রেখে অন্যান্য কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়; কাজেই কুরআনের বিকৃতির সম্ভাবনা আছে। আপনিই বলুন বর্তমানে যদি কুরআনের সব কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়, তাহলে কি কুরআন বিকৃত হবে? না হাফেজগণ অবিকৃত ভাবেই তা তেলাওয়াত করবেন? বর্তমান সময়ের চেয়ে সাহাবীগণের যুগে কুরআন

মুখস্থ করার আগ্রহ অনেক বেশী ছিল। হাজার হাজার হাফেজ সাহাবী, তাবেয়ী মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে ছিলেন। আরবি লিখন পদ্ধতির ভুলে যেন লিখিত কুরআনের মধ্যে কোনো ভুল প্রবেশ না করে এজন্য উসমান রা. আবুবকর রা.এর সংকলিত পান্ডুলিপিটির কয়েকটি কপি সর্বত্র প্রেরণ করেন। এবং নির্দেশ দেন যে, এ পান্ডুলিপির সাথে যে সকল লিখিত কুরআনের মিল হবে না সেগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয় যেন অহাফেজ সাধারণ মুসলিমগণ ভুল পড়া থেকে রক্ষা পায়। সামনে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

এই আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম খ্রিস্টানদের দাবী ইঞ্জিলও কুরআনের মতো অবিকৃত। এটা নিতান্তই মনগড়া ও ভুল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের এই চক্রান্ত থেকে হেফাজত করুন। তাদেরকেও হেদায়াত দান করুন। আমিন।

নবুওয়াত ও কিতাব বনী ইস্রায়েলের বংশে সীমাবদ্ধ

খ্রিস্টানদের দাবি:

নবুওয়াত ও কিতাব বনী ইস্রায়েলের বংশে সীমাবদ্ধ। অন্য কোনো গোত্রে নবী আসবেন না।

খ্রিস্টানদের দলিল:

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ [১].

আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তার বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব রাখলাম এবং দুনিয়াতে তাকে পুরস্কৃত করলাম। নিশ্চয়ই পরকালে সে সৎলোকদের অন্তরভুক্ত হবে।

১. আনকাবুত -২৭

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ অর্থাৎ আমি তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব রাখলাম। এর ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাফসীরে ইবনে কাসীরের মধ্যে লিখেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম আ. কে খলীল হিসেবে গ্রহণ করার সাথে সাথে তার বংশের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব দেওয়ার বিষয়টি তার জন্য এক মর্যাদার পোশাক ও উচ্চ সম্মানের বিষয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের জন্য ইমাম বানিয়েছেন। তার বংশধরদের মধ্যে দিয়েছেন নবুওয়াত ও কিতাব। ইব্রাহীম আ. এর পর থেকে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত সকল নবীগণই ছিলেন তার বংশধরদের মধ্যে থেকে বনী ইস্রাঈলের সকল নবী ছিলেন ইসহাক আ.এর বংশ থেকে। হযরত ঈসা আ. বনী ইস্রাঈলের সম্মানিত ব্যক্তি বর্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদেরকে আরবের কুরাইশ ও হাশেমী বংশের নবীর (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুসংবাদ দিলেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ট নবী। দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি আদম সন্তানদের সরদার। আল্লাহ তা'আলা তাকে খাঁটি আরবদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করেছেন। তিনি হবেন ইসমাঈল আ. এর বংশ থেক ।[২]

এখানে তো ঈসা আ. নিজেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তিনি হবেন ইসমাঈলী বংশের মধ্যে থেকে সুতরাং কীভাবে নবুওয়াত ও কিতাব শুধু বনী ইস্রাঈলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এটা তো তাদের মনগড়া কথা বৈ কিছু নয়।

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে

এই আয়াতে বলা হয়েছে ইসহাক ও ইয়াকুব আ. এর বংশে নবুওয়াত রাখলাম। আর ইয়াকুব আ. এর বংশ থেকেই বনী ইস্রাঈল। অতএব, কিয়ামত পর্যন্ত নবুওয়াত বনী ইস্রাঈলে সীমাবদ্ধ থাকবে।

উত্তর:

১.আপনাদের দাবির সাথে প্রমাণের সম্পূর্ণই অমিল। আপনি প্রথমে বলুন এই আয়াতের কোন স্থানে নবুওয়াত ও কিতাব বনী ইস্রাঈলে সীমাবদ্ধ? আর সীমাবদ্ধ কথাটি আয়াতে নেই, এই শব্দটি খ্রিস্টান

২. ইবনে কাসীর ৩/৩৯৭

প্রচারকগণ নিজেদের থেকে সংযোগ করেছেন। সরলমনা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য মনগড়া ব্যাখ্যা দিচ্ছে। খ্রিস্টান প্রচারকদের বলব, ভাই! আপনারা মনগড়া ব্যাখ্যা বাদ দিন, ভালো করে কুরআনের ভাষা শিখে কোনো আলেমের তত্ত্বাবধানে কুরআন শিখুন। পড়ুন। আল্লাহ তা'আলারনির্দেশ অনুযায়ী আমল করুন।

২নং উত্তর

২."নবুওয়াত শুধু বনী ইস্রাঈল বংশে সীমাবদ্ধ" এ কথাটি সঠিক নয়। ইহুদীদের উদ্ভব হলো হযরত মুসা আ. এর থেকে। হযরত মুসা আ. এর অনুসারীদেরকে বনী ইস্রাঈল বলা হয়। আর ইস্রাইল হলো হযরত ইয়াকুব আ. অন্যতম নাম। (ইস্রা অর্থ বান্দা, ইল অর্থ আল্লাহ তা'আলা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বান্দা।) তার বংশ পরম্পরায় বনী ইস্রাইল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুসা আ. ইয়াকুব আ. এর পূর্বেও অনেক নবী দুনিয়াতে এসেছেন যারা ইহুদি ছিলেন না।

৩.পূর্বে সমস্ত গোত্র বা জাতির জন্য পৃথক পৃথক নবী পাঠানো হতো। সে হিসেবে পৃথিবীতে শুধু বনী ইস্রাইলের ১২ গোত্র ছাড়াও আরো বহু গোত্র বিদ্যমান ছিল, যাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলা নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন। নি:সন্দেহে তারা ইহুদী বা বনীইস্রাইল ছিলেন না। তবে বনী ইস্রাঈলে অনেক নবী এসেছেন। তারা যখন তাওরাতের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলন যে, ইস্রাইল গোত্র ছাড়াও অন্য এক গোত্রে এমন এক নবী আসবেন যিনি হবেন সকল নবীর থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানিত। তাঁর নবুওয়াতই কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। আর কোনো নবী আসবেন না।

তবে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার উম্মত হয়ে দ্বিতীয় বার কিয়ামতের পূর্বে আসবেন। ইয়াহুদীরা চেয়েছিল তাদের গোত্রে নবী আসুক। তাদের দাবি ছিলো শুধুমাত্র তাদের গোত্রেই নবী আসবে। তারা রাসূলের সংবাদ জানতো। এমনকি তারা পুর্বে মারামারি করলে শেষ নবীর দোহাই দিত।

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেলো নবুওয়াত শুধু বনী ইস্রাঈলে সীমাবদ্ধ নয়। কুরআনের আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ[৩].

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ[৪].

হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন- যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।

প্রিয় পাঠক! এই দুটি আয়াত দ্বারা তাদের দাবি যে মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া ও প্রতারণার মাধ্যম, মুসলমানদের ইমান নষ্ট করার গভীর ষড়যন্ত্র। উল্লেখিত আয়াত দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল। দুআ করি আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টান সহ সকল অমুসলিমদেরকে হেদায়াত দান করুন। চিরশান্তি ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। সাথে মুসলমনদেরকে তাদের শিকার হতে হেফাজত করুন। আমিন।

---

[৩]. নাহল -৩৬

[৪] বাকারা -১২৯

জবিহুল্লাহ কে?

খ্রিস্টানদের দাবিঃ

(ক) জবিহুল্লাহ হলেন ইসহাক আ. ইসমাইল আ. নয়।

(খ) হযরত ইসমাঈল আ. এর বংশধর হলেন নিজের নফছের উপর জালিম ও অত্যচারী।

খ্রিস্টানদের দলিলঃ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (১০০) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (১০১) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (১০২) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (১০৩) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (১০৪) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (১০৫) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (১০৬) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (১০৭) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (১০৮) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (১০৯) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (১১০) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (১১১) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (১১২) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (১১৩)[৩]

অর্থ:

১০০. হে আমার পরওয়ারদেগার। আমাকে এক সৎপুত্র দান কর। ১০১.সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। ১০২. অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বলল: বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ্ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বলল: পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ তা'আলা চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। ১০৩. যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং ইব্রাহীম তাকে যবেহ্ করার জন্যে শায়িত করল, ১০৪. তখন আমি তাকে ডেকে বললাম: হে ইব্রাহীম! ১০৫. তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। ১০৬. নিশ্চয়ই এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। ১০৭. আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ্ করার জন্যে এক মহান জন্তু। ১০৮. আমি তার জন্যে এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি যে, ১০৯. ইব্রাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। ১১০. এমনভাবে আমি সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। ১১১. সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের একজন। ১১২. আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের, সে সৎকর্মীদের মধ্য থেকে একজন নবী। ১১৩. তাকে এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক নিজেদের উপর স্পষ্ট জুলুমকারী।

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম

এর ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর রহ. তাফসীরে ইবনে কাসীরের মধ্যে লিখেছেন- " غُلَامٍ حَلِيمٍ " পুত্র সন্তান দ্বারা ইসমাঈল আ. উদ্দেশ্য । কেননা তিনিই হলেন প্রথম সন্তান। যার সুসংবাদ ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেওয়া হয়েছে। আহলে কিতাব ও সকল মুসলমানদের ঐক্যমতে ইসমাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসহাক আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বড় ছিলেন। বরং আহলে কিতাবীদের কিতাবের মধ্যে আছে। ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ৮৬ বৎসর বয়েসে ইসমাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছেন। আর ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ৯৯ বৎসর বয়সে ইসহাক আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম আ.কে নির্দেশ দিয়েছেন তার একমাত্র পুত্রকে যবেহ করার জন্য। অন্য নুসখার মধ্যে আছে তার প্রথম সন্তানকে যবেহ করার জন্য। আহলে কিতাবরা মিথ্যা ও তুহমত বশত সেখানে ইসহাক আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছে। আর এটা (একের স্থানে অন্যকে ঢুকিয়ে দেয়া) জায়েয নেই। কেননা এটা তাদের কিতাবের নসের খেলাফ। আর তারা ইসহাক আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে, কারণ তিনি তাদের পিতা বা পূর্বপুরুষ। হিংসা বশত তারা এই কাজটি করেছে।

৩. আসসাফ্ফাত -১০০ থেকে ১১৩

আর তারা একমাত্র আর্থাৎ যে ছাড়া তুমার নিকট অন্য কেহ নেই। এ্টাকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। কারণ তখন শুধু ইসমাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন। তাছাড়াও তার প্রথম সন্তান যার পরে তার সন্তানদের মধ্যে হতে কেউ ছিল না। তার একমাত্র সন্তানকে যবেহ করার নির্দেশ দেওয়াটই পরীক্ষার জন্য আধিক .....

কুরআন ও হাদীস সাক্ষী ও দিকনির্দেশনা দিচ্ছে যে, জবিহ হলেন ইসমাঈল আ.। কারণ উনার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা غُلَامٍ حَلِيمٍ. (গুলামিন হালীম) এর কথা উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইসহাক আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রে বলেছেন, 'গুলামিন আলিম'. সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যাবিহ হলেন হযরত ইসমাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম । হযরত ইসহাক আ. কে যাবিহুল্লা বলাটা তাদের মনগড়া ও হিংসা বশত কথা। [৩]

হযরত ইসমাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম যবিহুল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়েকেরামের কিছু উক্তি।

১. হযরত ইবনে আব্বাস রা: হতে বর্ণিত আছে যাবিহ হলেন হযরত ইসমাঈল আ.।

২. হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত যে যাবিহ হলেন ইসমাঈল আ.।

৩. ইমাম শা'বি রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন যাবিহ হলেন ইসমাঈল আ.। এভাবে হাসান বসরী রা. হতে একই মত বর্ণিত ।

৪. মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরাজী হতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহিম; আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাকে যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম । [৩]

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে

এই আয়াত গুলোর মধ্যে কোথাও ইসমাইল আ. এর নাম উল্লেখ নেই বরং ১২২ নং আয়াতে ইসহাক আ. এর কথা উল্লেখ আছে তাই এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ইসহাক আ. কেই কুরবানী করা হয়েছে। ইসমাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নয়,

---

৩. কাসাসুল কুরআন ১/২৩০-২৩৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/১৫-১৬

৩. ইবনে কাসীর ৪/১৯

১নং উত্তর :

আমি খ্রিস্টান প্রচারকদেরকে জিজ্ঞাসা করি বলুন তো এই আয়াতগুলোর মাঝে কোন স্থানে আছে ইসহাক আ. কে কুরবানী করা হয়েছিল? এই আয়াতে কোথাও নেই যে, ইসহাক আ.কে কুরবানী দেয়া হয়েছে। মনগড়া ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেন না।

২নং উত্তর:

এই আয়াতটি আপনি বেশি বুঝেছেন? না যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তিনি বেশি বুঝেছেন? অবশ্যই তিনি বেশি বুঝেছেন। উনি তো কোনো দিন বলেননি, ইসহাক আ.কে কুরবানী দেওয়া হয়েছে। ১৪শত বছর পর আপনার মতো কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ একজন ব্যক্তি বুঝতে পারল জবিহুল্লা হলেন ইসহাক আ.। আপনার বুঝার দরকার, আপনি বুঝতে ভুল করেছেন।

৩নং উত্তর:

এই ব্যাখ্যা আপনি নিজে বুঝেননি। খ্রিস্টানগণ আপনাকে বুঝিয়েছে, বা খ্রিস্টানদের লেখা বই পড়ে আপনি বুঝতে পেরেছেন। আপনি কুরআন বুঝেন না। মানেনও না। একটি উদাহরণ দিলে আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মনে করুন কেউ ডাক্তারী শিখতে গেল ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। এবার ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কেমন ডাক্তারি শিখাবেন তা তো বুঝতেই পারছেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যদি ভুলও শিখিয়ে দেয়। কোনোরকম বুঝ দেয়ার মতো শিখিয়েছেন। এবার গ্রামে এসে ডাক্তারি শুরু করে দিলেন। আপনি ভুল চিকিৎসা করলেন, ফলে রোগী মারা গেল। তখন ধরা হবে আপনাকে। আপানার উস্তাদ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে নয়। মানুষ আপনাকেই অপরাধী বলে সাব্যস্ত করবে। আদালত বলবে আপনি ইঞ্জিনিয়ারের থেকে ডাক্তারি শিখলেন কেন? আপানার সার্টিফিকেট না থাকার দরুন আপনাকে হাতকড়া পরতে হবে। হাজতে যেতে হবে। শাস্তি ভোগ করতে হবে। মানুষ আপনাকে বোকা বলবে। কেউ আবার বলবে লোকটি পাগল। আপনার অবস্থাও ঠিক সেই বোকা ও পাগল ডাক্তারের ন্যায়। যারা কুরআন জানে,

এবিষয়ে বিজ্ঞ আলেম তাদের কাছে কুরআন না শিখে শিখতে গেলেন খ্রিস্টানদের কাছে। যারা হয়তো বাইবেলে পারদর্শি, কুরআনের নয়।

বিজ্ঞ উলামাদের কাছে গিয়ে কুরআন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন। সে অনুযায়ী আমল করার চেস্টা করুন।

৪ন ং উত্তর

১. খ্রিস্টানদের ব্যাখ্যাটিই প্রমাণ করে যে, তারা কুরআন সম্পর্কে খুবই অজ্ঞ। এখানে ইসহাক আ.এর আলোচনা যা আছে তা অন্য বিষয়ে কুরবানী সংক্রান্ত নয়।

২. ১০০নং আয়াতে হযরত ইব্রাহীম আ. আবেদন করলেন, رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে এক সৎপুত্র সন্তান দান করুন। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল (স্থীর বুদ্ধির) পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। ১১২-১১৩ নং আয়াতে ইব্রাহীম আ . কে আরো একটি পুত্রের সুসংবাদ দান করলেন। وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের, সে সৎকর্মীদের মধ্য থেকে একজন নবী। وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ তাকে এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক নিজেদের উপর স্পষ্ট জুলুমকারী।

এবার একটু লক্ষ করুন, আল্লাহ তা'আলা প্রথম সন্তানের ব্যাপারে বলেছেন,بِغُلَامٍ حَلِيمٍ আর দ্বিতীয় সন্তান ইসহাক আ.এর ব্যাপারে বলেছেন نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَযখন ইসহাক আ.এর জন্যصَّالِحِين নির্ধারিত হয়ে গেল, তাহলে বুঝা গেল حَلِيمٍ হলেন ইসমাইল আ.। কেননা কুরবানীর সময় সহনশীল ও ধৈর্যের দরকার, যা ইসমাইল আ. যেই ভূমিকা রেখে ছিলেন। আর তিনিই ছিলেন প্রথম পুত্র। যা কুরআনের ভাষায় বুঝা যায়। ইসমাইল আ. ধৈর্যশীল।[৩]

[৩]. সূরা আম্বীয়া.৮৫

ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বড় সন্তান

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ[৩] অর্থ. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলা রই, যিনি আমাকে এই বার্ধক্যে ইসমাইল ও ইসহাক দান করেছেন নিশ্চই আমার প্রতিপালক দোয়া শ্রবণ করেন।

৫নং উত্তর

নামের সিরিয়াল লিখতে হলে প্রথমে বড়ছেলের নাম লেখা হয়। এই আয়াতে প্রথমে ইসমাইল আ. এর নাম, পরে ইসহাক আ, এর নাম লেখা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় ইসলামাইল আ. বড় এবং অদ্বিতীয় সন্তান। আর ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কুরবানী দেওয়া হয়েছে।

বাইবেলের দ্বারা প্রমাণ

বাইবেলও প্রমাণ করে যে, জবিহুল্লাহ হলেন ইসমাঈল আ.। দেখুন আদিপুস্তকের ২২নং অধ্যায়ের বক্তব্য নিম্নরূপ

১. এই সমস্ত ঘটনার পর আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীমকে এক পরীক্ষায় ফেললেন। আল্লাহ তা'আলা ্ তাকে ডাকলেন," ইব্রাহীম।" ইব্রাহিম জবাব দিলেন, " এই যে আমি" ২. আল্লাহ তা'আলা বললেন তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলে ইসহাককে যাকে তুমি এতো ভালোবাস তাকে নিয়ে তুমি মরিয়া এলাকায় যাও সেখানে যে পাহাড়টার কথা আমি তোমাকে বলব, তার ওপরে তুমি তাকে পোড়ানো-কুরবানী হিসাবে কুরবানী দাও।[৩]

দেখার বিষয় হলো, ইসহাক আ. জন্ম থেকেই দ্বিতীয় পুত্র আর অদ্বিতীয় পুত্র হলো ইসমাইল আ.।

আদিপুস্তকের ১৬ নং অধ্যায়ে ইসমাইলের আ. জন্ম বিবরণে বলা হয়েছে, ১. ইব্রামের স্ত্রী সারী তখনো কোনো ছেলে মেয়ে হয়নি। হাজেরা নামে তার একজন মিসরীয় বান্দী ছিল। একদিন সারী ইব্রাহিমকে বললেন, "দেখ মাবুদ আমাকে বন্ধ্যা করেছেন। সেজন্য তুমি আমার বান্দীর কাছে

[৩]. সূরা ইব্রাহীম .৩৯, توضيح القران খন্ড-৩ পৃ.১৭১

[৩]. আদিপুস্তকের ২২:১-২

যাও। হয়তো তার মধ্য দিয়ে আমি সন্তান লাভ করবো। ৩. ইব্রাহিম সারীর কথায় রাজী হলেন। তাই কেনান দেশে ইব্রাহিমের দশ বছর কেটে ৪. যাওয়ার পর সারী তাঁর মিসরীয় বান্দী হাজেরার সঙ্গে ইব্রামের বিয়ে দিলেন। ইব্রাম হাজেরার কাছে গেলে পরে সে গর্ভবতী হল। ১১. ফেরেস্তা বললেন, "দেখ, তুমি গর্ভবতী। তোমার একটি ছেলে হবে। আর সেই ছেলেটির নাম তুমি ইসমাইল রাখবে। পরে হাজেরা আব্রামের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিল। আর আব্রাম হাজেরা গর্ভজাত আপনার সেই পুত্রের নাম ইসমাইল রাখিল ১৬. আব্রামের ছিয়াশি বৎসর বয়সে হাজেরা আব্রামের নিমিত্তে ইসমাইল কে প্রসব করল। °

এইবার ইসহাকের জন্ম বিবরনী দেখুন আদিপুস্তকের ১৭ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ১ আব্রামের নিরানব্বই বৎসরে সদা প্রভূ তাহাকে দর্শন দিলেন আর ঈশ্বর আব্রামকে কইলেন তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারি বলিয়া ডাকিওনা তাহার নাম সারা (রানী) হইল। ১৬. আর আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব তাহাতে সে জাতিগনের আদিমাতা হইবে আব্রাম কইলেন ইসমাইলই তোমার গোচরে বাঁচিয়া থাকুক তখন ঈশ্বর কহিলেন তোমার স্ত্রী সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে এবং তুমি তাহার নাম ইসহাক রাখিবে, আর আমি তাহার সহিত আমার নিয়ম স্থাপন করিব তাহা তাহার ভাবী বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী নিয়ম হইবে। ২০. আর ইসমাইলের বিষয়েও তোমার প্রথম শুনিলাম দেখ আমি তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করিব তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে ও ইনি তাহাকে বড় জাতি করিব এরপর ২১. অধ্যায়ে বলা হয়েছে ও আব্রামকে একশত বৎসর বয়সে তার পুত্র ইসহাকের জন্ম হয়। ২৫. অধ্যায়ে বলা হয়েছে ৮ পরে আব্রাহামের হওয়ায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন ৯. তাহার পুত্র ইসহাক ও ইসমাইল মকসেল গুহাতে তার কবর দিলেন।

উপরের বক্তব্যগুলি দ্বারা আমরা নিশ্চিত হই যে ইব্রাহীম আ. এর প্রথম পুত্র ইসমাইল আ. ইসমাইলের বয়স যখন ১৪ বৎসর হয় তখন ইসহাক নামক দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। ইসমাইল ১৪ বৎসর পর্যন্ত অদ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। আর ইসহাক জন্ম থেকেই দ্বিতীয় পুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন আর ইব্রাহীম আ. এর মৃত্যুর সময় ইসহাক ও ইসমাইল আ. উপস্থিত ছিলেন।

°রআদিপুস্তক -১৬:১-১১

আর আল্লাহ তা'আলা অদ্বিতীয় পুত্রকে কুরবানী দিতে বলেছেন। আর অদ্বিতীয় হলেন ইসমাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এবার বাইবেলে যেহেতু প্রমাণিত হলো যে, ইসমাইল আ. হলেন জাবিহুল্লাহ।

৬নং উত্তরঃ

ইসমাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুরবানী কথায় হয়েছিল? সবাই জানে মিনায়।

ঐ সময় ইসহাক আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় ছিলেন? বাইবেল বলে তার জন্মই হয়নি, হলেও সিরিয়ায়। আর যুগ যুগ ধরে মুসলমানগণ ঐ স্থানে কুরবানী দিয়ে আসছেন যা বাইবেল দ্বারা প্রমাণিত হলো। এসব আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো, কুরবানী ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া হয়েছিল, ইসহাক আ.কে নয়।

৭নং উত্তর :

খ্রিস্টানভাইদের জিজ্ঞাসা করব যদি ইসহাক আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কুরবানী দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আপনারা কুরবানী দেন না কেন?

একটি কারগুজারী

একবার দাওয়াতী সফরে গেলাম, ঠাকুরগাও জেলার হরিপুরে সেখানে আনওয়ার নামে একজন মুরতাদ হয়েছে। তাকে দাওয়াত দিলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি খ্রিস্টান হলেন কেন? উত্তরে বললেন, মুসলমানরা কুরানের উপর চলে না তাই। জিজ্ঞাসা করলাম কুরানের কোন বিষয় মানে না? উত্তরে বলল দেখুন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ইসহাক আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কুরবানী দেওয়ার কথা, মুসলমানরা বলে ইসমাইলের কথা। বললাম কুরআনের কোন স্থানে আছে আল্লাহ তা'আলা ইসহাককেই কুরবানী দিতে বলেছেন? সে খ্রিস্টানদের একটি বই থেকে উপর্যুক্ত আয়াত গুলো পেশ করলেন, বললাম বলুন তো (সূরা আলে-ইমরান-১১৯) আয়াতের কোন স্থানে লেখা আছে ইসহাককে কুরবানী দেওয়া হয়েছে? সে বের করতে ব্যর্থ হলো। তখন সে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়, এটা তাদের চিরন্তন অভ্যাস। যখন তাকে ভালোভাবে বললাম, আগে এর উত্তর দিন। পরে অন্য বিষয়ে

আলোচনা করবো। তখন সে অকপটে স্বীকার করে নিল, আমাকে এভাবেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ভালোভাবে বিষয়টি লক্ষ্য করিনি। খ্রিস্টান প্রচারকদের বড় একটি খারাপ অভ্যাস হল তারা যখন কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়, তখন অন্য বিষয়ে চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাদের সহিহ্ বুঝ দান করুন। হেদায়াত দান করুন। জাহান্নামের চিরস্থায়ী আগুন থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন। আমিন।

ঈমান আনতে হবে সকল আসমানী কিতাবের ওপর

খ্রিস্টানদের দাবি:

সমস্ত আসমানী কিতাবের ওপর ঈমান আনতে হবে।

খ্রিস্টানদের দলিল:

هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ **وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ**كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ[১].

দেখ! তোমরাই তাদের ভালোবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। **আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর**। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে- 'আমরা ঈমান এনেছি।' পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের ওপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আল্লাহ তা'আলা মনের কথা ভালই জানেন।

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

* এই আয়াতের মধ্যে পূর্বেবতী কিতাব সমূহে ঈমান আনতে বলা হয়েছে। মানতে বলা হয়নি।

* এই আয়াতের মধ্যে "**وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ**كُلِّهِ " বলা হয়েছে। আর তোমারা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস স্থাপন কর। এর ব্যাখ্যা ইবনে কাসীর রহ. লিখেন– সকল কিতাবের ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের সন্দেহ ও পেরেশানী রয়েছে তাতে তোমাদের কিতাব এবং না ইতিপূর্বে গত হয়েছে তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমাদের কিতাবের ব্যাপারে তাদের সন্দেহ পোষণ করেও অস্বীকার করে।[২]

---

১. আল ইমরান -১১৯

২. ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড ৩৮৮ পৃ:

এখানে শুধু ঈমান আনতে বলা হয়েছে-বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। কিন্তু মানতে হবে একথা বলা হয়নি। সূতরাং আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করি কিন্তু মানি না।

যেভাবে অপব্যাখ্যা করেঃ

এই আয়াতে বলা হয়েছে " আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাসকর" তাই বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জিল এগুলোও পূর্ববর্তী কিতাব তাই কিতাব গুলো মানতে হবে।

উত্তরঃ

দাবির সাথে প্রমাণের কোনো মিল নেই। কারণ, এই আয়াতটি কোন্ বিষয়ের তাও খ্রিস্টান ভাইদের জানা নেই।

'কথা সত্য মতলব খারাপ।'

হ্যাঁ আমরা পূর্ববর্তী কিতাব গুলো বিশ্বাস করি। তবে অনুসরণ করি না। কারণ আল্লাহ তা'আলা অনুসরণ করতে বলেননি, বরং বিশ্বাস করতে বলেছেন।

জেনে রাখা দরকার, বিশ্বাস এক জিনিস, আর অনুসরণ ভিন্ন জিনিস। তার পরও আমরা বর্তমান তাওরাত ইঞ্জিলকে বিশ্বাস করি না। কারণ এগুলো আল্লাহ তা'আলার কালাম নয়। আমরা ঐ তাওরাত ইঞ্জিলকে বিশ্বাস করি; যা হযরত মুসা ও ঈসা আ. এর ওপর অবতীর্ণ হয়ে ছিল।

কোথায় আছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা?

খ্রিস্টানদের দাবিঃ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা কুরআনে কোথাও নেই। অতএব নামাজ পড়ার প্রয়োজন নেই। না পড়লেও চলবে।

দলিলঃ

খ্রিস্টানরা এই দাবির পক্ষে কোনো দলিল পেশ করে না। বরং চাপাবাজি করে সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট করে। গলাবাজিই হলো তাদের পুঁজি।

উত্তরঃ

খ্রিস্টান ভাইদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা, ভাই! 'আপনারা তো খ্রিস্টান'। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা কুরআনে আছে কি নেই এতে আপনার প্রয়োজন কী? আপনারা তো বিশ্বাস করেন ঈসা আ. আল্লাহ তা'আলার পুত্র। আচ্ছা বলুন তো বাইবেলে কোথায় আছে ঈসা আ. বলেছেন আমি আল্লাহ তা'আলার ঔরসজাত সন্তান? আমি নিজেই আল্লাহ? তোমরা আমাকে প্রভু মানো? এ কথা বাইবেলে কোথাও নেই। তাহলে, এসব গল্প কেচ্ছা-কাহিনী আপনারা মানেন কেন?

আপনারা ঘটা করে বড় দিন পালন করেন। এই বড়দিন পালনের কথা বাইবেলে কোথায় পেলেন? নিজেরা যা পালন করছেন তার প্রমাণ নিজের কাছে নেই। নিজেরা কি করছেন তার খবর নেই। আবার মুসলমানদের নামাযের কথা কুরআনে আছে কি-না তা নিয়ে টানাটানি। আগে নিজেদের ভীত মজবুত করুন। তারপর অন্যের ভিত্তি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করুন। এরপরও আপনাদের প্রশান্তি লাভের জন্য নিম্নে কিছু উত্তর পেশ করলাম।

আমরা মুসলমান। আমরা কুরআন মানি। হাদিসও মানি। কুরআনে যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা আছে। তার ব্যাখ্যা হাদিসে আরো স্পষ্ট আছে। আমি এখানে কুআন ও হাদিস থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রমাণ পেশ করছি।

কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা আছে।

যেমন,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا[১].

সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি (বিশেষভাবে পরীক্ষিত) হয়।

অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মতে এই আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ । এখানে لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ এর মধ্যে ৪টি নামাজ এসে গেছে। যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। وَقُرْآنَ الْفَجْرِ এখানে قُرْآن শব্দ বলে নামাজ আর الْفَجْر বলে ফজরের ওয়াক্ত বোঝানো হয়েছে।

আয়াতের ব্যাখ্যা

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ"তোমরা সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় থেকে নামাজ কয়েম কর"

আলোচ্য আয়াতের 'لِدُلُوكِ ' শব্দটির ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:), হযরত যাবের (রা:), তাফসীরকার কাতাদা (রা:), হযরত আতা (রা:), হাসান বসরী (রা:) সহ অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরামের মতে, এ শব্দটির অর্থ সূর্য ঢলে যাওয়া।

ইবনে মরদযিয়া (রা:) হযরত ওমর (রা:) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। হযরত আব্দল্লাহ ইবনে মাসউদ আনসারী (রা:) বর্ণিত হাদীস যা ইসহাক ইবনে রাহবিয়া তার মুসনাদে, আর ইবনে মরদিয়া তার তাফসীরে এবং বায়হাকী আল মা'রেফতে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন জিব্রাইল আ. সূর্যের لِدُلُوكِ এর সময় যখন সূর্য ঢলে গিয়ে ছিল। তখন আমার নিকট আসেন এবং আমাকে যোহরের নামাজ আদায়ে করান। অন্য একদল তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরামের মতে দুলুক অর্থ হল অস্ত যাওয়া, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ মতটি পোষণ করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রাহ:) তার কিতাব তাফসীরে মাযহারীতে লিখেছেন, যদি শব্দটির অর্থ সূর্য ঢলে যাওয়া গ্রহণ করা হয়, তবে আলোচ্য আয়াতে পাঁচটি নামাজের কথা এসে যায়। সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং 'কুরআনুল ফজর' তথা ফজরের নামাজ এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাগিদ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

' قُرْآنَ الْفَجْرِ'

যেহেতু পবিত্র কুরআন পাঠ নামাজের আবিচ্ছেদ্য অংশ তাই "কুরআনুল ফজর" বলে ফজরের নামাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। [২]

শুধু তাই নয় তাফসীরে বাগভীতে রয়েছে দুলুক শব্দটি দুটো অর্থকেই শামিল করে (অস্ত যাওয়া ও ঢলে পড়া) যেহেতু অধিকাংশ বর্ণনা ঢলে পড়ার দিকে সেহেতু ঢলে পড়া অর্থ নেয়াটাই শ্রেয়। এর পর আল্লামা বাগভী (রাহ:) লিখেছেন– যদি ঢলে পড়া অর্থই নেয়া হয় তাহলে আয়াতটি নামাজের সবগুলো সময়কেই একত্রিত করবে, সুতরাং "لِدُلُوكِ الشَّمْسِ " যোহর ও আসরের নামাজকে অন্তর্ভুক্ত করবে। "ইলা গাসাকিল লাইলী" মাগরিব ও এশার নামাজকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এবং "কুরআনাল ফজর" সকালের নামাজ তথা ফজরের নামাজকে অন্তর্ভুক্ত করবে।[৩]

অতএব গ্রহণযোগ্য মুফাস্সিরীনে কেরামদের তাফসীর এর মাধ্যে প্রমাণীত হইল ৫ওয়াক্ত নামাজ কুরআন দ্বারাই প্রমাণীত আছে।

وَالْعَصْرِ (১) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

১. বনি ইসরাইল -৭৮

২. তাফসীরে মাজহারীর ৫ম খণ্ডের ৪৬৫ পৃ:

৩. তাফসীরে বাগভীর ৩য় খণ্ডে ১২৮নং পৃ:

উপরে উল্লিখিত আয়াতে 'ওয়াল আস্‌র' শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আসরের নামাজের কসম খেয়েছেন একাধিক তাফসীরের কিতাবে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যেমন. তাফসীরে বাগভী, ও তাফসীরে মাজহারীতে, একই বর্ণনা এসেছে, মুকাতিল (রা:) বলেন, আয়াতে 'আসর' বলার দ্বারা আসরের নামাজের কসম খেয়েছেন।[৩]

* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[৩].

হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর।

এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্যে কোনো দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হবে। এমনইভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে ফজর, যোহর, এবং এশার নামাযের কথা উল্লেখ রয়েছে।

৩.

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

এখানে স্পষ্টভাবে আসর শব্দ আছে।

---

[৩]. তাফসীরে মাজহারী, খণ্ড-১০, পৃ:৩৩৭। তাফসীরে বাগভী খণ্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা ৫২২-৫২৩।

[৩]. সূরা নূর-৫৮

৪. এছাড়াও খ্রিস্টানরা কোনো ব্যাখ্যা বুঝতে চায় না। তারা বলে কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত তথা ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এই শব্দগুলো কুরআনে নেই। তখন আমরা তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত শব্দ গুলো তাদেরকে নিম্ন আয়াতগুলোর মাধ্যমে বুঝিয়ে দিব।

১. ফজর।

[৩]وَالْفَجْرِ

এখারেন ফজর শব্দটি স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

২. যোহর।

وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ[৩]

এই আয়াত দুটির মধ্যে যোহর শব্দটি স্পষ্ট উল্ল্যেখ আছে।

৩.আসর।

[৩]وَالْعَصْرِ

এখানে আসরের নামাজের কথা স্পষ্ট ভাবে আছে।

৪. মাগরিব।

[৩]فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ

এই আয়াতে মাগরিব শব্দটিও দেয়া আছে।

৫. এশা।

[৩]صَلَاةِ الْعِشَاءِ

এই আয়াতে এশার নামাযের কথা সুস্পষ্ট ভাবে লেখা আছে।

---

[৩]. সূরা ফাজর-১

[৩]. সূরা নূর-৫৮

[৩]. সূরা আসর-০১

[৩]. সূরা - বাকারা-২৫৮

[৩]. সূরা নূর-৫৮

ফায়সালা হবে ইঞ্জিল অনুযায়ী

খ্রিস্টানদের দাবি:

ফায়সালা হবে ইঞ্জিল অনুযায়ী

তাদের দলিল:

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[১]

ইঞ্জীলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ তা'আলা তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফায়সালা করা। যারা আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী।

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা:

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আহলুল ইঞ্জিলদের ইঞ্জিল অনুযায়ী ফায়সালার কথা বলেছেন। অথচ আমরা জানি যে, ইঞ্জিল কিতাব রহিত হয়ে গিয়েছে। এখন সঠিকটা জানার জন্য আমাদের মুফাসসিরদের স্মরনাপন্ন হতে হবে। বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসিরে কুরতুবীতে আল্লামা কুরতুবী রহ. লিখেছেন- যদি يَحْكُمْ দ্বারা নির্দেশ উদ্দেশ্য হয় তখন অর্থাত ইঞ্জিলের অধিকারীরা কেবল ঐ সময়ই ফায়সালা করবে কিন্তু বর্তমান ইঞ্জিল কিতাব রহিত হয়ে গেছে। (অতএব এর মধ্যে কোনো ফায়সালা চলবে না।)।[২]

---

১. সুরা-মায়েদা-৪৭

২. তাফসিরে কুরতুবী ৩/১২৩

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে:

এই আয়াত দেখিয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে যে, আল্লাহ তা'আলা ইঞ্জিল অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করতে বলেছেন তাই মুসলমানদের ইঞ্জিল অনুযায়ী ফায়সালা করতে হবে।

১নং উত্তর:

এই আয়াতই তাদের জওয়াব। আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে أَهْلُ الْإِنْجِيلِ ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত" এখানে ইঞ্জিল ওয়লাদের বলা হয়েছে, তারা তাদের মধ্যে ইঞ্জিল অনুযায়ী বিচার করবে। মুসলমানদের জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নয়। কারণ মুসলমানগণ হলেন আহলুল কুরআন, আহলুল ইঞ্জিল নয়। অতএব, খ্রিস্টানরা ইঞ্জিল অনুযায়ী বিচার ব্যাবস্থা বাস্তবায়ন করুন।

এবার খ্রিস্টান ভাইদের বলতে চাই। আপনাদের ইঞ্জিল অনুযায়ী বিচার কার্য সম্পূর্ণ করুন। তা পারবেন না। কারণ, আপনাদের কিতাব অসম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ। এটা মানব রচিত গ্রন্থ। এর মধ্যে মানুষের কোনো সমস্যার সমাধান নেই। পারলে দেখান তো দেখি। আমি কিছু তালিকা দিচ্ছি এগুলোর বিচার বা ফায়সালা ইঞ্জিল থেকে বের করে দিন।

১. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর অনেক সম্পদ রেখে গেল। উদাহরণ স্বরূপ ৪ বিঘা জমি রেখে গেলো। বেঁচে ছিল ৩ মেয়ে ২ ছেলে এবার ইঞ্জিল অনুযায়ী এর সামাধান দিন। এই জমির সুষ্ঠু বণ্টন কীভাবে হবে?

২. ইঞ্জিল অনুযায়ী চুরির শাস্তি কী? ইঞ্জিল থেকে প্রমাণ দিন।

৩. ডাকাত ও রাহজানীর শাস্তি কী? ইঞ্জিল থেকে প্রমাণ দিন।

৪. একজন অন্যজনকে অন্যায়ভাবে মারলো এর সমাধান কী? ইঞ্জিল থেকে প্রমাণ দিন।

৫. কেউ কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিলো। ইঞ্জিল অনুযায়ী এর সমাধান কী?

৬. একই সম্পদের দু 'জন দাবিদার। ইঞ্জিল অনুযায়ী এর সমাধান কী?

৭. কেউ কারো মেয়েকে অপহরণ করল। ইঞ্জিল অনুযায়ী এর সমাধান কী?

৮. লেন-দেন এর সমস্যা। ইঞ্জিল অনুযায়ী সমাধান কী?

৯. ব্যাংকিং সম্পর্কিত সমস্যা সমূহের ইঞ্জিল অনুযায়ী এর সমাধান কী?

১০. পৃথিবীতে কোথাও কি খ্রিস্টিয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা আছে? যারা ইঞ্জিলের আইন মেনে চলে?

১১. বিচার ব্যবস্থার সমস্যার ইঞ্জিল অনুযায়ী সমাধান কী?

১২. রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালার সমস্যা। ইঞ্জিল অনুযায়ী সমাধান কী?

১৩. নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেই সমস্যাগুলো হয়। ইঞ্জিল অনুযায়ী সমাধান কী?

১৪. বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যা ইঞ্জিল অনুযায়ী সমাধান কী?

১৫. রাজনৈতিক ভাবে হরতাল ডাকা হয় ইঞ্জিল অনুযায়ী সমাধান কী?

১৬. কয়দিন পরপর শুনা যায় বাংলাদেশের আইন সংশোধন হয়, ফলে অনেক আন্দোলন মিছিল হয়। পক্ষে বিপক্ষে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। ইঞ্জিল অনুযায়ী সমাধান কী?

১৭. সহশিক্ষা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক মতভেদ আছে। ইঞ্জিল অনুযায়ী সমাধান কী?

১৮. শিক্ষা ব্যাবস্থা, দূর্নীতি, ছাত্র-ছাত্রীদের সেশন জট ইত্যাদি। ইঞ্জিল অনুযায়ী এর সমাধান কী?

১৯. তরুন-তরুনীদের প্রেম-প্রীতিতে বাঁধা পড়লেই আত্মহত্যা করছে ইঞ্জিল অনুযায়ী সমাধান কী?

এমন অনেক সমস্যায় মানব জাতি হাবুডুবু খাচ্ছে, এসব কোনো সমস্যার সমাধান বাইবেল বা বর্তমান তাওরাত ইঞ্জিল দিতে পারবে না। এর সমাধান এ সব কিতাবে নেই। কারণ, এগুলো মানব রচিত বই । আল্লাহ তা'আলার কালাম নয়। পক্ষান্তরে কুরআনে সকল সমস্যার সমাধান আছে। কারণ এটি মানুষের স্রষ্টার কালাম। তিনি মানবের সমস্যা সম্পর্কে খুব ভালো করে জানেন। তাই তিনি মানবের সকল সমস্যার সমাধান তার এই কালামেপাক ও তার প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

২নং উত্তরঃ

কুরআন ইহুদী-খ্রিস্টানদেরকে তাওরাত, ইঞ্জিলের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে, তাওরাত-ইঞ্জিলের নামে শিরক্ ও ব্যভিচার প্রতিষ্ঠার বা প্রচারের নির্দেশ দেয় নি। আগে আপনারা খ্রিস্টানগণ আপনাদের ব্যক্তি, দেশ ও রাষ্ট্রগুলিতে তাওরাত-ইঞ্জিলের তাওহীদ ও আইন বিধান প্রতিষ্ঠা করুন। শিরক, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপের কিতাব নির্দেশিত শাস্তি প্রতিষ্ঠা করুন। সকল খ্রিস্টান চার্চে ঈসা মসীহ, তার মাতা মরিয়ম ও অন্যান্য অগণিত মানুষের প্রতিমা বিদ্যমান। তাওরাত ইঞ্জিলের বিধান অনুসারে এগুলো ধ্বংস করুন। যারা এগুলিকে বানিয়েছে, এগুলোতে ভক্তি বা মানত-উৎসর্গ করেছে বা উৎসাহ দিয়েছে তাদের সকলকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করুন। এরপর তাওরাত-ইঞ্জিল নিয়ে আসুন।

পূর্বের কিতাব বাতিল হয়নি

খ্রিস্টানদের দাবি: মুসলমানগন জানেন পূর্ববর্তী কিতাব বাতিল হয়ে গেছে। এবার খ্রিস্টানদের দাবি হলো যদি পূর্বের কিতাব বাতিলই হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা ্ তার নবী পূর্ববর্তী কিতাব পাঠকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করতে বললেন কেন? আর আল্লাহ তা'আলা ্ পাক তো সব জানেন। আপনার সন্দেহ থাকলে পূর্বের কিতাবীদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন।

তাদের দলিল:

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

অর্থ: সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না।

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা:

فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ অর্থাৎ হে নবী আপনি আপনার পূর্ববর্তী যারা কিতাব পাঠ করে তাদের জিজ্ঞাসা করুন। আসলে জিজ্ঞাসা কাদেরকে করবে এ ব্যাপারে আল্লামা বগভী রাহ. তার কিতাব মাআলিমুততানঞ্জিল তথা তাফসিরে বগভীতে লিখেছেন।

হযরত আব্দল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.মুজাহিদ রহ.এবং যাহ্যাক রহ. প্রমুখ তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাব বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা আহলে কিতাবদের মধ্যে ঈমানদার ছিলেন। (অর্থাৎ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে।) যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তার সাথীবর্গগণ। তারা সাক্ষ্য দিবে তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্নিত যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্যতার ব্যাপারে এবং নবুওয়অতের খবর দিয়ে দিবে।[৩]

[৩]. তাফসীরে বগভী- ২/৩৬৮

ইমাম আব্দুসসাউদ রাহ. বলেন আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন কারণ তা তাদের নিকট বিদ্ধমান । যা আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি। পাদ্রীদেরকে জিজ্ঞাসা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- তাদের কিতাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্পর্কে যেই ভবিষ্যদ্বাণী পেশ করা হয়েছে তা যেন তারা প্রকাশ করে।[৩]

যেভাবে তারা অপব্যাখ্যা করে:

'গুনাহগারদের জন্য বেহেস্তে যাওয়ার পথ' -৯ নং পৃষ্ঠায় লিখেছে " আপনি হয়ত বলিবেন, ঐ কিতাবগুলো তো পূর্বের লোকদের জন্য দেয়া হইয়াছে। এখন তো শেষ নবীর কাছে শেষ কিতাব কুরআন শরীফ দেয়া হয়েছে। আমরাতো কুরআন শরীফ মান্য করিব। উপর্যুক্ত আয়াতে লক্ষ করুন কুরআন শরীফ নবীজী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কী নির্দেশ দিয়েছেন, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি উহাতে যদি তোমার সন্দেহ থাকে তবে তোমরা পূর্বের কিতাব যাহারা পাঠ করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় যেমন পূর্বের কিতাব যদি বাতিল হয়ে থাকে, অথবা কেউ তা বদলে ফেলে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা তো সব কিছু জানেন। তবে কীভাবে আল্লাহ তা'আলা বাতিল কিতাব বা বদলে ফেলা কিতাব যারা পাঠ করে তাদের কাছে নবীজীকে যেতে বলবেন?

দ্বিতীয়ত: আমাদের মধ্যে অনেকেই কুরআন শরীফ না বুঝলে হাদিস বা তাফসীরে চলে যান বা যেতে বলেন। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন কুরআন শরীফ কি এই নির্দেশ দিয়েছে? অথবা যাহারা এই হাদিস বা তাফসীর লিখেছেন তারা কি কেউ পূর্বের কিতাব জানেন? বা পাঠ করেন? লক্ষ্য করুন ৯৫নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবীজী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সতর্ক করে দিয়েছেন। যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াত অস্বীকার করে তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত না হতে। তাহলে তিনি নিজেও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। তাই আমাদের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যথেষ্ট সতকর্তা অবলম্বন করা উচিৎ।"[৩]

[৩]. তাফসিরে আব্দুসসউদ-৩/১৭৫

[৩]. গুনাহ্গারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ -৯

১নং উত্তরঃ

এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হল আসল ও অবিকৃত কিতাব। বর্তমান যারা কিতাবুল মুকাদ্দাস, বাইবেল পড়ে, তাদের পাঠকদের জিজ্ঞাসা করতে বলা হয়নি। কারণ এগুলো আসামানী কিতাব নয়।

আমি খ্রিস্টান ভাইদেরকে বলতে চাই, আপনারা পারলে ঈসা আ. ও মুসা আ. এর ওপর যেই কিতাব অবতীর্ণ হয়ে ছিল এমন একটি কিতাব এনে দেখান। বা তাদের পাঠকারীদের একজনকে এনে উপস্থিত করুন।

২নং উত্তরঃ

এই আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে আমাদেরকে নয়।

৩নং উত্তরঃ

এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে, কুরআন শরীফ বুঝে না আসলে হাদিস ও তাফসীরের দিকে চলে যান। যারা হাদিস বিশারদ ও মুফাসসির তারা কি বাইবেল পড়েছেন? এও বলে হাদিস তো অনেক পড়ে এসেছে, তাহলে তা মানব কেন? কুরআন কি তা মানার নির্দেশ দিয়েছে? আমি খ্রিস্টান ভাইদেরকে বলতে চাই, আমাদের হাদিস ও তাফসীর আপনাদের বাইবেল ও বর্তমান প্রচলিত তাওরাত, ইঞ্জিল থেকে অনেক বিশুদ্ধ। আমাদের কাছে হাদিসের সনদ (পরম্পরা) আছে। আপনাদের বাইবেলে তার লেশমাত্রও নেই। আপনাদের কার্যক্রম হলো মুনাফেকের মতো মুখে বলেন একটি, করেন অন্যটি। আপনারা তাফসীর জানেন না, তাহলে ইঞ্জিলের তাফসীর লিখেন কেন?

খ্রিস্টান ভাইদেরকে বলতে চাই, বলুন তো কুরআনের কোন স্থানে আছে হাদিস তাফসীর মানা যাবে না? মুফাসসির বা মুহাদ্দিসীনদের পূর্বের কিতাব বাইবেল পড়তে হবে? বা জানা থাকতে হবে? এটা কুরআনে বা বাইবেলের কোথাও আছে কি? এর কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবেন কি? পারবেন না।

খ্রিস্টানদের নিকট আরো একটি প্রশ্ন আপনারা হাদিস, তাফসীর মানেন না তাহলে আপনি যে আয়াত থেকে যেই ব্যাখ্যাটি দিলেন এটা কুরআনের কোন স্থানে আছে? কারণ আপনি তো কুরআন ছাড়া আর কিছুই মানেন না। তাহলে এই ব্যাখ্যা দিলেন কেন? আপনারা ইঞ্জিলের তাফসীর লিখলেন কেন?

৪নং উত্তর

কুরআন, হাদিস ও তাফসীর মানার নির্দেশ দেয় এর প্রমাণ নিম্নে পেশ করলাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ°

আল্লাহ তা'আলা জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ তা'আলার, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জিভূত না হয়। রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।

لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ °

"আপনার কাছে সত্য কুরআন এসেছে তাতে তোমরা সন্দীহান হয়ো না"

আমি খ্রিস্টান ভাইকে বলব, আপনি কি কুরআনের এই অংশটুকু পড়েছেন।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল হাদীস এবং তাফসীর মানতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে মানার তৌফিক দান করুন। আমিন।

°. সূরা ইউনুস..৯৪

খ্রিস্টধর্ম ভালোবাসার ধর্ম

খ্রিস্টানদের দাবি: ইসলাম হানা-হানির ধর্ম। আর খ্রিস্টধর্ম হলো ভালোবাসার ধর্ম ।

তাদের দলিল: "যীশু বলেন তোমার এক গালে থাপ্পর দিলে অপর গালটি পেতে দিও। হাওলা দিতে হবে।

উত্তর:

কি ভয়ঙ্কর মিথ্যা! যে ধর্মের পোপ-পাদ্রীগণ বিগত প্রায় ২ হাজার বছর ধরে ধর্মের নামে কয়েক কোটি মানুষকে জেলে দিয়ে, জবাই করে বা জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে তারা তাদের ধর্মকে শান্তির ধর্ম বলে দাবি করেন! যিশু বলেন: "পরন্তু আমার এই যে শত্রুগণ ইচ্ছা করে নাই যে, আমি তাদের উপরে রাজত্ব করি, তাহাদিগকে এই স্থানে আন, আর আমার সাক্ষাতে বধ কর।"[০]

কী ভয়ঙ্কর কথা! নবী-রাসূল তো দূরের কথা কোনো জালিম শাসক কি এরূপ নির্দেশ দিতে পারে? কেউ হয়ত বলতে পারেন, যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদেরকে হত্যা করা। কোনো জালিম হয়ত বলতে পারেন, আমার রাজত্বের বিরূদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে হত্যা কর। কিন্তু শুধু তার রাজত্ব অপছন্দ করে বলে নিরস্ত্র মানুষদেরকে ধরে এনে জবাই করা!! তাও আবার নিজের সামনে! জবাই-এর সময় মানুষ ছটফট করে তা দেখার জন্য? মানুষের রক্ত দেখে মন ঠান্ডা করার জন্য? এরূপ ভয়ঙ্কর নির্দেশ কি কোনো নবী প্রদান করতে পারেন?

কিতাবুল মুকাদ্দাসের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধবন্ধী, নিরস্ত নারী, পুরুষ, শিশু ও অবলা প্রাণী নির্বিচারে হত্যা করতে, বিধর্মীদের উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলতে, সরলপ্রাণ বিধর্মীদেরকে খানাপিনার দাওয়াত দিয়ে তাদের হত্যা করতে, নিরস্ত্র বন্দীদেরকে জবাই করার বা পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

---

০. লুক ১৯:২৭

এ সকল 'পবিত্র' নির্দেশের ভিত্তিতেই যুগে যুগে খ্রিস্টান পাদ্রী ও পোপগণ লক্ষ-কোটি মানুষকে ধর্মের নামে হত্যা করেছেন। লক্ষ-কোটি নিরপরাধ বিজ্ঞানী, গবেষক, সাহিত্যিক, ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বী ও অন্যধর্মাবলম্বী মানুষকে হত্যা, জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা, কারাগারে আবদ্ধ রাখা, নির্মম অত্যাচার করা বা জোরপূর্ব ধর্মান্তর করা খ্রিস্টান পাদ্রী-পোপ ও শাসকদের অতিপরিচিত ইতিহাস।

এ কথা সত্য যে, মুসলিমগণ অনেক সময় ইসলামের শিক্ষা না বুঝে বা বিকৃত করে হানাহানিতে লিপ্ত হন। তবে খ্রিস্টানগণ যে ধরনের হানাহানি ও ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হয়েছেন সে তুলনায় মুসলিমদের হানাহানি কিছুই না। বিভিন্ন মুসলিম দেশে খ্রিস্টানরা অন্যায় ভাবে আক্রমন করেছে। ফিলিস্তীনের উপর শিশু নারীদের উপর নির্মম নির্যাতন এসব কী? কারা হানাহানি করেছে? আফগানিস্তানে নির্মম ভাবে নিরপরাধ মানুষকে ধরে ধরে মারছে। শিশুদেরকে এতিম করেছে। মাদেরকে বিধবা বানিয়েছে। পিতাকে সন্তান হারা করেছে। একটি শান্তিগামী দেশকে বোমা মেরে তামা বানিয়ে দিয়েছে। এরা কারা? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ ওবামা কোন ধর্মের? ইরাকে অন্যায় ভাবে হামলা করল কারা? ইরানের উপর হামলা করল কোন ধর্মের লোকেরা। এখনো বিভিন্ন দেশে অন্যায় ভাবে আক্রমণ করছে কারা? বুশ, ওবামা শপথের সময় কোন ধর্মের গ্রন্থের উপর হাত রেখে রাষ্ট্রিয় শপথ গ্রহণ করে? বাইবেলের উপর শপথ নিয়ে ধর্মের জন্যই মানুষ হত্যা করছে। এটা কোন ধর্মের শিক্ষা? অবশ্যই বলতে হবে খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা। নিজেরা বিশ্বজুড়ে অশান্তির আগুন জ্বালাচ্ছেন আর মুখে বুলি আউরাচ্ছেন আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করছি। দাবি করছেন শান্তির ধর্ম। মুসলমানেরা অন্যায় ভাবে কোনো দেশের উপর আক্রমণ করেছে এমন একটি প্রমাণও দেখাতে পারবেন না। যখন ইসলামী খেলাফত ছিল সকল ধর্মের লোকেরা শান্তিতে ছিল। খ্রিস্টধর্মের লোকেরাই এই শান্তি সহ্য করতে পারেনি। তারা কলহ সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন দেশে বিভক্ত করেছে। সারা বিশ্বে অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে। এই আগুন নিভানো সম্ভব এক মাত্র ইসলামের উপর চলার মাধ্যমেই। তাই আমি আপনাদের ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য দাওয়াত দিচ্ছি। মুসলমান হয়ে যান। জাহান্নামের চিরস্থায়ী আগুন থেকে বেঁচে যাবেন। হে আল্লাহ! আপনার এই গাফেল বান্দাদের হেদায়াত দান করুন। তাদেরকে আপনার জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। হে

আল্লাহ! আপনি অন্তরজামি সকল অমুসলিমদের অন্তরকে খুলে দিন ইসলামকে কবুল করার জন্য। আমিন।

ইসলাম ধর্ম কঠিন আর খ্রিস্টধর্ম সহজ

খ্রিস্টানদের দাবি: ইসলাম কঠিন আর খ্রিস্টধর্ম সহজ।

প্রমাণ: অজু, নামাজ, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি পালন করা অনেক কষ্টের কাজ এগুলো নাজাত পাওয়ার জন্য শর্ত নয়। খ্রিস্টধর্মে এতো কিছুর প্রয়োজন নেই।

উত্তর:

(ক) সরল-সহজ মানুষকে প্রতারণা করার এটি বড় অস্ত্র। এ অস্ত্র দিয়ে সাধু পল ঈসা মাসীহের ধর্মকে নষ্ট করেছে। তার অনুসারীদের মূল কথা হলো, শুধু ঈসাকে বিশ্বাস করলেই মুক্তি। কোনো কর্মের প্রয়োজন নেই। ব্যভিচার, নরহত্যা, দুর্নীতি, মাদকতা ইত্যাদি যত পাপই কর না কেন যীশু তোমাকে ত্রাণ করবেন। হিটলারের মতো নরহত্যাকারীকেও!! বিশ্ব মানবতাকে ধ্বংস করার জন্য এর চেয়ে বড় প্রতারণা কী হতে পারে? বর্তমান বিশ্বে মানবতার অধঃপতন, নৈতিক অবক্ষয়, দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, মাদকতা ও হিংস্রতার প্রসারের মূল কারণ সাধু পলের এ ধর্ম।

(খ) প্রচলিত খ্রিস্টধর্মে আল্লাহ তা'আলার যিকর, দুআ, ইবাদত বা শরিয়ত বলে কিছুই নেই। এমনকি রবিবারে চার্চে যাওয়াও খ্রিস্টধর্মের কোনো জরুরী দায়িত্ব নয়। শুধু বিশ্বাস কর আর পাপ কর। এজন্য আমরা দেখি যে, সকল খ্রিস্টান পাদ্রীগণ কর্তৃক খ্রিস্টান চার্চগুলির মধ্যে যে পরিমাণ ব্যভিচার, ধর্ষণ, শিশুধর্ষণ ইত্যাদি ভয়ঙ্কর পাপ সংঘটিত হয়, বিশ্বের অন্য কোনো ধর্মের ধর্মগৃহে এর শতভাগের একভাগ পাপাচারেরও নযির নেই। আর এজন্যই ইউরোপ-আমেরিকার অগণিত উচ্চশিক্ষিত খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণ করছেন। তার অন্যতম কারণ খ্রিস্টধর্মে আল্লাহ তা'আলার যিকর, গুণগাণ, পরকাল-মুখিতা ইত্যাদি কিছুই নেই। চার্চে গেয়ে যে প্রার্থনা করা হয় তাও দুনিয়া মুখি। আর আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা ও গুণগান ও আল্লাহ তা'আলার যিকির ছাড়া কখনোই মানুষের হৃদয় প্রশান্তি পায় না।

(গ) প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম সহজ নয়। মানুষের বানানো ধর্ম যা হয়। মনগড়াভাবে একদিক সহজ করতে যেয়ে অন্যদিক কঠিন হয়ে গিয়েছে। এ

ধর্মে হারামকে হালাল করা হয়েছে আর হালালকে হারাম বানানো হয়েছে হারাম ।

(ঘ) এ ধর্মের সবচেয়ে কঠিন হলো বিশ্বাস। খ্রিস্টান প্রচারকগণ বলেন যে, শুধু যীশুকে বিশ্বাস করলেই মুক্তি পাওয়া যাবে। তবে কীভাবে তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে তা সত্যিকার অর্থে কেউ বলতে পারে না। ত্রিত্বের স্বরূপ কী? পিতার সাথে পুত্রের সম্পর্ক কী? যীশু কীভাবে ঈশ্বর? তিনি কি জন্ম থেকে ঈশ্বর না মানুষ হিসেবে জন্মে পরে ঈশ্বরত্ব লাভ করেছেন? তিনি কীভাবে পুত্র? তার মধ্যে একটি ব্যক্তিত্ব বা দুটি ব্যক্তিত্ব? ইত্যাদি অগণিত আকিদাগত বিষয়ে উদ্ভট সব মতভেদ। কোনো একটি বিশ্বাসের উপর তারা ঐক্যমত প্রাকাশ করতে পারে না। শান্তি ও সহজ এক বিষয় নয়। প্রেমিকের নির্দেশ পালনে যে প্রশান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যায়, মনগড়া চলার মধ্যে তা পাওয়া যায় না। ইসলামের প্রতিটি বিধান মানার মধ্যেই রয়েছে শান্তি। বাহ্যিক ভাবে দেখতে কষ্ট লাগেতে পারে কিন্তু এর মধ্যেই রয়েছে প্রশান্তি। খ্রিস্টধর্ম হলো মানব রচিত ধর্ম এখানে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধান। শয়তানের বিধানেই বেশী কারণ এধর্মটির উৎসই হল মানব রচিত। খ্রিস্টধর্ম এই নামটিই আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নয়, মানব রচিত ধর্ম। খ্রিস্টানদের এই দাবি খ্রিস্টধর্ম সহজ আর ইসলাম কঠিন এটা নিতান্তই উদ্দেশ্য প্রণীত মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটি মাধ্যম। খ্রিস্টধর্ম সহজ হওয়ারই কথা, কারণ তা হলে শয়তানের দেওয়া মন চাহি ধর্ম। এই জন্য এই ধর্ম সহজ মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে সহজধর্ম হলো ইসলাম। কারণ এই ধর্ম হলো আল্লহ প্রদত্ব। আল্লাহ নিজেই বলেছেন 'আল্লাহ তোমাদের সজহ চান।'

খ্রিস্টান ভায়েরা চাপাবাজি ছাড়া কোনো প্রমাণ দিতে পারে না। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে কোথাও নেই যে, খ্রিস্টানধর্ম সহজ। পক্ষান্তরে ইসলামধর্ম সহজ এর বহু প্রমাণ কুরআন হাদিসে বিদ্যমাণ। যা পূর্বে আলোচানা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমিন।

মুহাম্মদ সা. শাফায়াত করতে পারবেন না

খ্রিস্টানদের দাবি: মুহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফায়াত করতে পারবেন না।

তাদের দলিল:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ[১]

জেনে রাখুন, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ তা'আলার তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (১) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا[২]

নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে একটা ফায়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট। যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতে ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ[১]

অর্থ: ধৈর্য ধারণ করুন, নিশ্চই আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য। আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা চান। এবং সকাল সন্ধ্যা আপনার প্রভুর প্রশংসা করুন।

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

উল্লেখিত আয়াতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। অথচ আমরা জানি নবীগণ মা'সুম তার পরেও নবীজীকে 'ইসতিগফার' করার কথা বলা হলো কেন, এর উত্তর জানতে হলে আমাদেরকে মুফাস্সিরীনে কেরামগণের শরণাপন্ন হতে হবে।

---

১. সূরা মুহাম্মদ-১৯
২. সূরা ফাতাহ-১-২

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'তাফসীরে কুরতুবীতে' লিখেছেন– ইস্তেগফারের দুটি অর্থ হতে পারে।

১.আপনার থেকে যে ত্রুটি হয়ে গেছে তার থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

২.আল্লাহ তা'আলা যেন আপনাকে গুনাহ থেকে রক্ষা করেন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।,[৩]

আয়াতের তরজমায় 'যাম্ব' এর অর্থ করা হয়েছে ত্রুটি, এখন কথা হল এমন কোন ধরনের ত্রুটি নবীজী থেকে হয়েছে যার জন্য আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বলেছেন.

তাফসীরে মা'রেফুল কুরআনে আল্লামা ইদ্রীস কান্দলবী রহমেতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন.-

১.'যাম্ব' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দুর্বলতা, কমতি, অথবা ইজতিহাদী মাসয়ালায় আল্লাহ তা'আলার মর্জি মুতাবেক হুবহু না হওয়া।

২. আর শরীয়তের আইনে ইজতিহাদী ভুল গুনাহ নয়, বরং এই ভুলের সাওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গাম্বরগণকে এই ভুল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করে দেয়া হয়। এবং তাঁদের উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভুলকে 'যাম্ব' তথা গুনাহ শব্দের মাধ্যমে ও ব্যক্ত করা হয়।[৩] [৩]

যেভাবে অপব্যাখ্যা করা

"গুনাহগারদের জন্য বেহেস্তে যাওয়ার পথ" বইয়ের ১৭ নং পৃষ্ঠায় আছে "একজন পাপী অন্য পাপীকে সুপারিশ করতে পারে না। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাপী (নাউযুবিল্লা) যদি পাপ না করতেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা চাইতে বললেন কেন? এবং দিনে সত্তর বার ক্ষমা চাইতেন। তাই তিনি শাফাআত করতে পারবেন না। উদাহরণ দিয়ে বলে, আগুন দিয়ে আগুন নিভানো যায় না। আগুন নিভাতে হলে পানির প্রয়োজন হয়। ঠিক গুনাহ থেকে মুক্তির জন্য বেগুনা লোকের প্রয়োজন।

[৩]. তাফসীরে কুরতুবী ৫ম খণ্ড. ১৭৪নং পৃ:.

[৩]. তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন -৭ম খণ্ড- ৪১০নং পৃ: মুফতী ইদ্রীস কান্দলভী রহঃ

[৩]. তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন ৮ম খণ্ড ৩৫ পৃ: মুফতী শফী রহঃ

আর ঈসা নবী বেগুনা। তার কোনো গুনাহই নেই। তাই তিনি পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারবেন।" [৩]

উত্তরঃ

খ্রিস্টান প্রচারকদের জিজ্ঞাসা করব, আগে বলুন কুরআনে কোন স্থানে আছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফাআত করতে পারবেন না। দাবির সাথে আপনারা যেই আয়াত পেশ করেছে এখানে শাফাআত কথাই নেই। এখানে তারা মনগড়া একটি ব্যাখ্যা দিয়েছে। তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা তো আর দলিল হতে পারে না। খ্রিস্টান প্রচারকদের জিজ্ঞাসা করবো, আপনারা তো তাফসীর মানেন না, তাহলে এখানে তাফসীর করলেন কোন যুক্তিতে? এধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা থেকে বিরত থাকুন। খ্রিস্টানরা সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারে না। শুধু মনগড়া ব্যাখ্যাই তাদের পুঁজি। তাদের এই দাবিটা নিতান্ত মিথ্যা। এ পর্যায়ে বাইবেল থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করবো তাদের এই দাবিটি যে মিথ্যা। দেখুন.....

(ক) এক পাপী অন্য পাপীর শাফা'আত করতে পারবেন না কথাটি মহা মিথ্যা। বাইবেল প্রমাণ করে, পাপীর সুপারিশও আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন। খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, মূসা, হারূন ও অন্যান্য সকল নবী পাপী ছিলেন। (নাঊযুবিল্লাহ) বাইবেলে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন। ইস্রায়েল-বংশীয় যখন গোবৎস পূজা করলেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকেই ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন মূসা আ. তাদের জন্য সুপারিশ করেন এবং আল্লাহ তা'আলা সুপারিশ গ্রহণ করেন।[৩]

২নং উত্তর

ঈসা মাসীহ নিষ্পাপ কথাটিও বাইবেলের আলোকে মহা মিথ্যা কথা। আমরা মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঈসা আ. ও অন্যান্য সকল নবী-রাসূল নিষ্পাপ ছিলেন। কিন্তু কিতাবুল মুকাদ্দাস বা প্রচলিত ইঞ্জিলকে আল্লাহ তা'আলার কালাম বলে বিশ্বাস করলে

[৩]. গুনাহ্গারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ -১৭

[৩]. যাত্রা পুস্তক ৩২:৭-১৪

বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈসা আ. মহাপাপী ছিলেন। কারণ, পূর্ববর্তী একটি অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে, যীশু মানুষদেরকে গালিগালাজ করতেন।[১] অন্য বংশ বা ধর্মের মানুষদেরকে শূকর ও কুকুর বলে বিশ্বাস করতেন, গালি দিতেন, এরূপ ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দিয়েছেন।[২] পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদেরকে চোর-ডাকাত বলতেন।[৩] নিরপরাধ মানুষদেরকে অভিশাপ দিতেন।[৪] অকারণে হত্যা করতেন।[৫] অবিশ্বাসীদেরকে নির্বিচারে ধরে ধরে তার সামনে জবাই করার নির্দেশ দিতেন।[৬] মিথ্যা ওয়াদা ও ভবিষ্যদ্বাণী করতেন।[৭] মদ পান করে মাতাল হতেন।[৮] বেশ্যা মেয়েদেরকে তাঁকে স্পর্শ করতে ও চুম্বন করতে দিতেন।[৯] এগুলি যদি পাপ না হয় তাহলে পাপ কী? এসব দ্বারা প্রমাণিত হল খ্রিস্টানদের যীশু পাপী। তাদের কথা অনুযায়ী একজন পাপী অন্যকে পাপ মুক্ত করতে পারবেন না। তাই যীশুও তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবেন না। এখন মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি।

৩নং উত্তর

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাপী কথাটিও কুরআন, হাদীস ও বাস্তবতার আলোকে মহা মিথ্যা কথা।

তিনি শাফায়াত করবেন এ বিষয়ে হাদিছে আনেক প্রমাণ আছে।

হাদিস দ্বারা প্রমাণ নবী

ইসমাইল ইবনু আবান ইবনু উমর রা. থেকে বর্নিত তিনি বলেন নিশ্চই কিয়ামতের দিন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। প্রত্যেক নবীর উম্মত নিজ নিজ নবীর অনুসরণ করবে। তারা বলবে হে (অমুক) নবী! আপনি সুপারিশ করুন। হে অমুক নবী ! আপনি সুপারিশ করুন। তারা কেউ সুপারিশ করতে রাজী হবেন না। শেষ পর্যন্ত সুপারিশের দায়িত্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের উপর বর্তাবে। আর এদিনেই আল্লাহ তাআলা তাকে প্রশংসিত স্থানে (১) (মাকামে মাহমুদ) প্রতিষ্ঠিত করবেন। মাকামে মাহমুদ অর্থ প্রশংসিত স্থান কিয়ামতের দিন আল্লা তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামকেই সর্ব প্রথম শাফা য়াত কারীর মার্যাদা দান করে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।[১]

আপনি বলতে পারেন কুরআন থাকতে হাদিস কেন? আমরা হাদিস মনি। আমরা মুসলমান। খ্রিস্টান নই। আমরা আপনাদের বাইবেল ও কিতাবুল মুকাদ্দাসকে আল্লাহ তা'আলার কালাম বলে বিশ্বাস করি না। আপনারা যেই বাইবেলের দাওয়াত দিচ্ছেন। আপনারা হলেন প্রতারক মুখে বলেন একটা আর অন্তরে রাখেন অন্যটা। মুখে বলেন আমরা কুরআন মানি। বাস্তবে তা মানেন না। যদি কুরআন মানেন। তাহলে মুসলমান হোন না কেন? কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন।

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম।"[২]

অন্যত্র এরশাদ করেছেন

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।[৩] উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা খ্রিস্টানদের দাবিটি মিথ্যা ও ভুল প্রামাণিত হল।

---

১. মথি ১৬:২৩, ২৩:১৩-৩৩
২. মথি ৭/৬, ১৫/২২-২৮,
৩. যোহন ১০/৭-৮,
৪. মথি ২৩/৩৫-৩৬,
৫. মথি ২১/১৮-২১,
৬. লুক ১৯/২৭,
৭. মথি ১৬/২৭-২৮
৮. লূক ৭/৩৪-৫০
৯. (যাহন ১১/১-৫

১. সহীহ বুখারী - ৪৩৫৯
২. সূরা আলে ইমরান-১৯
৩. সূরা আলে ইমরান-৮৫

সকল মানুষ পাপী, আর পাপিরা জান্নাতে জাবে না

খ্রিস্টানদের দাবি : সকল মানুষ পাপী আর পাপিরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারে না। আদম আ. পাপী। আর আমরা তার সন্তান হিসাবে আমরাও পাপী।

তাদের দলিল:

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ **وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى**[১]

অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ[২]

অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশত: মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আপনার প্রতিপালক এসবের পরে তাদের জন্যে অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে

খ্রিস্টানদের বই 'গুনাহগারদের জন্য বেহেস্তে যাওয়ার পথ'-২নং পৃষ্ঠায় আছে, "তারা আল্লাহ তা'আলার কথার অবাধ্য হইয়া তিনি যাহা করিতে নিষেধ করিয়া ছিলেন তাহাই করিলেন। যাহার ফলে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি স্বরূপ তাহাদিগকে এই পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন। কারণ আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করিবার ফলে তাহারা গুনাহগার হইয়া গিইয়া ছিলেন।" [৩]

---

১. সূরা ত্বাহা - ১২১
২. সূরা নাহল-১১৯
৩. গুনাহ্গারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ -০২

আদম আ. গন্ধম খেয়ে পাপ করেছেন। সেই পাপের শাস্তি স্বরূপ দুনিয়াতে এসেছেন। আমরা হলাম তাদেরই সন্তান। তাদেরই রক্ত আমাদের গায়ে প্রবাহিত হয়েছে। ফলে মানুষ জন্মগতভাবে গুনাহগার। এই গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা'আলা তার ছেলে ঈসাকে পাঠিয়েছেন, তিনি সকলের পাপকে মাথায় নিয়ে শূলিতে চড়ে পাপমুক্ত করেছেন। অতএব, আমরা যদি ঈসা আ. কে বিশ্বাস করি তাহলে সকল পাপ মাফ হয়ে যাবে।

তাদের লেখিত বই গুনাহগারতের জন্য বেহেস্তে যাওয়ার পথ বইয়ের ১৭ নং পৃষ্ঠায় লিখেছে "উপর্যুক্ত আয়াত অনুসারে আমরা যদি অজ্ঞতা বশতঃ গুনাহ করি ও তাহার জন্য তওবা করি এবং সংশোধন করি অর্থাৎ ঐ সমস্ত গুনাহের কাজ হইতে ফিরি তাহা হইলে আমাদের তাওবা কবুল করিবেন। এখন প্রশ্ন হইল আমরা জানিয়া শুনিয়া ও বুঝিয়া গুনাহ করিতেছি কি না? অথবা আমরা ঐ সমস্ত গুনাহের কাজ হইতে নিজদিগকে বিরত করিতেছি কি না? যদি বিরত না করিয়া থাকি তাহা হইলে আমরা গুনাহের মধ্যেই ডুবিয়া রহিয়াছি, আর এই গুনাহের শাস্তি একটি সূইয়ের ছিদ্র দিয়া উট যাওয়া যেমন কষ্ট একজন গুনাহগারের শাস্তিও তদ্রুপ। আমরা জানি, সূইয়ের ছিদ্র দিয়া উট যাওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয়। তেমনিভাবে আমাদের পক্ষেও সমস্ত শরিয়ত পালন করে ১০০% খাঁটি হইয়া বেহেস্তে যওয়া অসম্ভব। গুনাহগার হইবার জন্য অনেকগুলো গুনাহ করিবার প্রয়োজন নাই। একটিমাত্র গুনাহই যথেষ্ট। যেমনিভাবে হযরত আদম আ. সদাসদ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল (গন্ধম) খাইয়া আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য হইয়াছিলেন। যেমনি ভাবে একজন ফেরেস্তা আজাজিল হযরত আদম আ. কে সেজদা না করিয়া আল্লাহ তা'আলার কথার অবাধ্য হইয়া ছিল। সে আজও শয়তান বা ইবলিশ হইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের প্রতিনিয়ত গুনাহের দিকে লইয়া যাইতেছে। এখন আপনি হয়তো বলিবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তরিয়ে নিয়া যাইবেন। অবশ্যই এই বিষয়ে আমরা কুরআনে কোনো আয়াত দেখতে পাইতেছি না।..... " [৩]

১নং উত্তর ঃ

---

৩. গুনাহ্গারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ -১৭

প্রথমত আদম আ.পাপী এ কথাটা ভুল। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাআলা তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

অতঃপর হযরত আদম (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি (করূণাভরে) লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।[৩]

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى

আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে [৪]

কুরআনের এই আয়াতগুলো দ্বারা প্রমানিত হলো যে, আদম আ. কে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। ফলে উনি নিষ্পাপ হয়ে গেলেন। তার জন্য তার সন্তানদের পাপী হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

২নং উত্তর

একজনের পাপের জন্য অন্যকে শাস্তি দেয়া এটি একেবারে অযৌক্তিক একটি কথা। এটি জুলুম। আল্লাহ তা'আলা জুলুমকারী নয়। আল্লাহ তা'আলা জুলুমকে পছন্দও পরেন না। আর আল্লাহ তা'আলা হলেন ন্যায় পরায়ন।

একজনের পাপের কারণে অন্যকে শাস্তি দেয়া হবে না

কুরআন দ্বারা প্রমাণঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

[৩]. বাকারা-৩

[৪]. সূরা ত্বাহা - ১২১

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ** أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

আপনি বলুন: আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য প্রতিপালক খোঁজব, অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক? যে ব্যক্তি কোনো গোনাহ্ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে।[৫]

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (৩৮) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

কোন ব্যক্তি কারও গোনাহ্ নিজে বহন করবে না, ৩৯. এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে, ।[৬]

এই আলোচনা ও প্রমাণাদি দ্বারা আমাদের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল, একজনের পাপের জন্য অন্যজনকে শাস্তি দেওয়া হবে না।

[৫]. সূরা আল আন্আম-১৬৪

[৬]. সূরা আন নাজ্ম-৩৮-৩৯

বাইবেল দ্বারা প্রমাণ

১. দ্বিতীয় বিবরণ- ২৪:১৬

২. মথি- ১২: ৩৭

মানুষ জন্মগত ভাবে নিষ্পাপ

১. যিশাইয়া- ৩০: ২৮

২. যিহিষ্কেল - ১৮: ২০

৩. মথি - ৭: ১-২

পাপের ক্ষমা করবেন আল্লাহ তা'আলা যীশু নয়-

১. যিশাইয়া- ৪৩:১২-১৩

২. মথি- ৬: ১৪

কুরআন ও বাইবেল দ্বারাই প্রমাণ হলো একজনের পাপে অন্য জন পাপী হবে না, সকল মানুষ জন্মগত পাপী একথাটিও ভুল প্রমাণিত হল। অতএব, খ্রিস্টানদের এই দাবি নিতান্তই অযৌক্তিক ও ভুল। ভুল থেকে ফিরে সত্যের পথে আসার অনুরোধ করছি। আপনারা মুসলমান হয়ে মুক্তি পেয়ে যাবেন।

খ্রিস্টধর্মের পরিত্রাণ কি বিশ্ব জনীন না নির্দিষ্ট জাতির জন্য?

প্রশ্নউদয় হয় খ্রিস্টধর্মের পরিত্রাণ কি বিশ্বজনীন? অন্য কথায় ঈসা আ. কি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত? না তিনি শুধু বনিইস্রায়েলদের হারানো ভেড়াদের জন্য। দেখুন বাইবেল কী বলে।

যীশু হলেন ইস্রায়েল বংশের লোকদের নবী। আমাদের বাংলাদেশীদের নবী নন। কারণ যীশু নিজেই বলেছেন, "আমি ইস্রায়েল বংশের নবী"। দেখুন মথি লিখিত সুসমাচারের ১৫:২৪ নং পদে লেখা আছে "উত্তরে যীশু বললেন, আমাকে কেবল ইস্রায়েল বংশের হারানো মেষদের কাছেই পাঠানো হয়েছে। [৩]

আবার মথি লিখিত সুসমাচারের ১০:৫ নং পদে লেখা আছে, "যীশু সেই বারোজনকে এই সব আদেশ দিয়ে পাঠালেন, "তোমরা অইহুদীদের কাছে বা শমরীয়দের কোনো গ্রামে যেয়ো না, বরং ইস্রায়েল জাতির হারানো মেষদের কাছে যেয়ো। " [৩]

বাইবেলের এই আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, যীশু হলেন শুধু ইস্রায়েল বংশের নবী। ইস্রায়েল ছাড়া অন্য কোনো জাতীর নবী নন। কুরআনও তাই বলে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "স্মরণ কর যখন মারইয়াম-তয়ন ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বনী ইস্রায়েল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি একজন রাসূল সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ।" [৩] (উল্লেখ্য হযরত মুহাম্মদ ﷺএম নাম ছিল আহমদ।)

যুক্তির দাবিও হলো যীশু আমাদের নবী নন। যেমন আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হলেন শেখ হাসিনা। তার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খালেদা জিয়া। প্রশ্ন হলো, এখন আমরা কাকে প্রধানমন্ত্রী মানবো? অবশ্যই শেখ হাসিনাকে। কারণ তিনি হলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। তবে খালেদা জিয়াকে সম্মান করাবো। ঠিক তেমনিভাবে যীশু হলেন পূর্ববর্তী নবী। তাকে আমরা সম্মান করবো; কিন্তু মানতে হবে বর্তমান নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। কারণ তিনি হলেন বর্তমান নবী।

একথা বললে আমার খ্রিস্টান ভাইয়েরা বলে থাকেন যে, মথির ২৮:১৯এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। যে, "তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদেরকে আমার উম্মত কর। " [৩]

কিন্তু এই উক্তিটি হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা না। সম্ভবত সেন্ট পৌলের কোনো শিষ্য এটা জুড়ে দিয়েছেন। কারণ–

ক. এটাতো ঈসা আ.এর বক্তব্য স্ববিরোধী হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। বিশেষ করে প্রথমত; বক্তব্য তাঁর জীবদ্দশায় নবুওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করার সময়ের, আর শেষ বক্তব্যটি কথিত কবর থেকে উঠে শিষ্যদের সঙ্গে দেখা করার সময়ের। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন এবং ধর্ম প্রচার করেছেন তখন বলেছেন, আমি কেবল ইস্রায়েল বংশের মেষদের (লোকদের) নিকটেই প্রেরিত হয়েছি, তোমরা অ-ইহুদীদের বা শমরীয়দের কোনো গ্রামে

[৩]. মথি-১৫:২৪

[৩]. মথি ১০:৫

[৩]. সূরা আস-ছাফ-:৬

[৩]. মথি ২৮:১৯

যেওনা, বরং ইস্রায়েল বংশের লোকদের নিকটে যেও, আর মৃত্যুর পর তিনি বলবেন "তোমরা সকলকে আমার উম্মত কর" এটা বিশ্বাস- যোগ্য হতে পারে না।

খ. ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তাঁর প্রধান শিষ্য সেন্ট পিটার (পিতর) অনেক লোকের সামনে বলেছিলেন, আপনারা তো জানেন যে, একজন ইহুদীর পক্ষে একজন অ-ইহুদীর সংগে মেলামেশা করা বা তার সংগে দেখা করা আমাদের শরীয়তের বিরূদ্ধে।[৩]

ঈসা আ. যদি সত্যিই সকলকে শিষ্য করার নির্দেশ দিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে তাঁর প্রধান শিষ্য এমন কথা বলবেন, তা কি চিন্তা করা যায়?

গ. সেন্ট পিতর নিজেও লিখেছেন, ইহুদীদের নিকট সুখবর প্রচার করার ভার যেমন পিতরের উপর দেওয়া হয়েছিল, তেমনই অ-ইহুদীদের নিকট সুখবর প্রচার করার ভার খোদা আমার উপর দিয়েছেন। [৩]

হযরত ঈসা আ. ঐদিন বাস্তবেই শিষ্যদেরকে সকলের নিকট খ্রিস্টধর্মের দাওয়াত পৌঁছানোর আদেশ দিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে পৌল কেন বলছে, ইহুদীদের নিকট সুখবর প্রচার করার ভার পিতরকে দেওয়া হয়েছিল?

ঘ. ইঞ্জিলের ইব্রাণী নামক পত্রে আছে, প্রভু বলেন, দেখ! সময় আসিতেছে যখন আমি ইস্রায়েল ও এহুদার লোকদের জন্য একটা নতুন ব্যবস্থা স্থাপন করিব। উক্ত পত্রে একই অধ্যায়ে ১০ নং পদে বলা হয়েছে, প্রভু আরও বলেন, সেই সময়ের পরে ইস্রায়েলীয়দের জন্য আমি এই ব্যবস্থা স্থাপন করিব।

এসব থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পুরাতন ও নতুন নিয়ম উভয়টাই কেবল ইহুদীদের জন্য ছিল। সুতরাং নতুন নিয়ম নিয়ে আগমনকারী হযরত ঈসা আ.ও কেবল তাদেরই নবী ছিলেন, অন্যদের নয়।

ঙ. ঈসা যে ঐ কথা বলেননি তার আরেকটি প্রমাণ হলো, তিনি তার শিষ্যদেরকে একথাও বলেছিলেন যে, আমি তোমাদের সত্যই বলছি ইস্রায়েল দেশের সমস্ত গ্রামে তোমাদের যাওয়া শেষ হওয়ার আগেই মনুষ্যপুত্র আসবেন। [৩]

সুতরাং ইহুদীদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানো শেষ হওয়ার আগেই যেহেতু তার পুনরাগমন ঘটবে, তাই তিনি অ-ইহুদীদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর আদেশ দিবেন কোন যুক্তিতে?

চ. তিনি যদি ঐ কথা বলে থাকেন, তবে লূক ও ইউহান্নার পক্ষে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি আদেশ উল্লেখ না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

---

৩. প্রেরিত, ১০:২৮

৩. নগালাতীয়. ২:৭

বর্তমান কুরআন আসল কুরআন নয়

খ্রিস্টানদের দাবি: বর্তমান কুরআন আসল কুরআন নয়।

তাদের দলিল: একটি ভুল ও বানোয়াট ইতিহাস থেকে দলিল দিয়ে থাকে। তারা বলে "আমাদের কাছে বর্তমানে যে কুরআন শরীফ রয়েছে এই কুরআন শরীফটি হযরত ওসমান রা. কর্তৃক সংকলিত। সে সময় তার নিকট ১৭টি দল ১৭টি পান্ডুলিপি হস্তান্তর করেন। যার মধ্যে একটি পান্ডুলিপি রেখে বাকী ১৬টি পান্ডুলিপি তিনি পুড়িয়ে ফেলেন। যে কারণে একই দিনে ঐ ১৬ দলের লোকেরা তাকে নামায পড়া অবস্থায় তীর মেরে হত্যা করেন। যার জন্য আমরা অনেকে বলে থাকি যে, হযরত ওসমান রা. জীবন দিয়ে কুরআন শরীফ রক্ষা করেছেন। ঐ ১৬টি পান্ডুলিপি যা পুড়িয়ে ফেলা হয়ে ছিল।..... কে আলীর ইতিহাস." [৩]

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে:

খ্রিস্টানরা বলে ওসমান রা. সকল কুরআন পুড়ে ফেলেছেন। আর নিজে একটি কুরআন রচনা করেছেন, সেটিই হলো বর্তমান কুরআন। এই জন্যই এটাকে মাসহাফে ওসমানী বলা হয়।

উত্তর:

মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য খ্রিস্টানরা বিভিন্ন মিথ্যা ও বানওয়াট ঘটনার আশ্রয় নেয়। ঠিক এখানে যেই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সেটাও তাদের বানানো একটি ঘটনা। যেই বইয়ের বরাত দিয়েছে তাও কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের গ্রন্থ নয়। নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে কুরআন সংকলনের ইতিহাস বর্ণনা করা হলো। তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

---

৩. গুনাহ্গারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ -১১-১২

কুরআন সংকলনের ইতিহাস

দ্বীন ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য এক চিরন্তন জীবন ব্যবস্থা। তাই এর প্রথম ও প্রধান বুনিয়াদ আল কুরআনের সংরক্ষণ। এর দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন:-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।[৩]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:-

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিকে থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। [৩]

অর্থাৎ যা কুরআনের অংশ নয় তা কখনো কোনো ভাবে কুরআনে প্রবেশ করতে পারবে না। কুরআনকে সর্ব প্রকার ধ্বংস, বিলুপ্তি থেকে হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন।

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি,(জিবরাঈর-এর মাধ্যমে) তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব। সূরা- কিয়ামা-১৭-১৯)

- পবিত্র কুরআনুল কারিমের সংরক্ষণের দায়িত্ব যেহেতু সয়ং আল্লাহ তা'আলাই নিয়েছেন, আর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত, কখন কোন্ যুগে কী পন্থায় সংরক্ষণ করতে হবে তা তিনি সংরক্ষণ করেই দেখিয়েছেন। যার ইতিহাস আমাদের নিকট সমুজ্জল বা দিবালোকের ন্যায়

---

৩. সূরা হিজর-৯

৩. সূরা হা মিম সাজদা-৪২

স্পষ্ট। রাসূল ﷺ থেকে আজ পর্যন্ত এর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সামান্যতম দুর্বলতার কোনো লেশ বা চিহ্ন আল্লাহ তা'আলা রাখেন নাই।

পবিত্র কুরআনের লিখিত যে কপিটি আমাদের নিকট রয়েছে তার নাম "মাসহাফে উসমানী" (অর্থাৎ উসমান রা. এর সংকলন)

● হক বাতিলের লড়াই চিরন্তন- তাইতো বাতিল, হক্বের সমুজ্জ্বল আলোকে সহ্য করতে পারে না। হক্বের আলোকে গ্রহণ না করে, তার মাঝে তিল পরিমাণ ত্রুটি তালাশ করতে থাকে, আর গঠিত সেই তিলকে নিজের উপস্থাপনার নতুন মোড়কে সাজিয়ে তাল বানিয়ে হক্বের প্রপাগাণ্ডা ছড়ায়। ঠিক তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও জোতির্ময় আসমানী গ্রন্থ আল কুরআনুল কারিম এর জোতির্ময় আলোকে সাদরে গ্রহণ না করে ত্রুটির তিল বের করতে ব্যর্থ হয়ে পরিশেষে "মাসহাফে উসমানী" নামটিকেই তারা তিল হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের গঠিত মোড়কে তাল বানিয়ে উপস্থাপন করে,পবিত্র কুরআন ও ইসলামের প্রপাগাণ্ডা ছড়ায়।

এই সমস্ত বিভ্রান্তকর প্রপাগাণ্ডা থেকে যেন সরলমনা সাধারণ মুমিন-মুসলমানগণ প্রতারিত হয়ে ঈমান হারা না হন-সে জন্য প্রয়োজন মাসহাফে উসমানীকে জানা।

'মাসহাফে উসমানী' আসলে কী? কী তার ইতিহাস? আর সেই প্রয়াসেই নিম্নে রাসূল ﷺ থেকে শুরু করে হযরত উসমান (রা.) পর্যন্ত পবিত্র কুরআন সংকলনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত ভাবে পেশ করা হলো।

রাসূলের যুগে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ

সম্পূর্ণ কুরআন মাজিদ যেহেতু একবারে নাযিল হয়নি বরং বিভিন্ন প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী এর বিভিন্ন আয়াত নাযিল হতে থাকে। তাই নবী ﷺ-এর যুগে কুরআন মাজিদের শুরু থেকেই গ্রন্থাকারে লিখে সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিলো না। তাই, ইসলামের প্রথম যুগে কুরআন সংরক্ষণের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি জোর দেয়া হতো স্মরণশক্তির ওপর। প্রথম দিকে যখন ওহী নাযিল হতো নবী ﷺ সঙ্গে সঙ্গে তার শব্দাবলি পুনরাবৃত্তি করতে থাকতেন যেন তাহা ভালোভাবে মুখস্থ হয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কিয়ামার কয়েকটি আয়াত নাযিল করা হয় এবং তাতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন যে, কুরআন মাজিদকে মুখস্থ রাখার জন্য ঠিক ওহী নাযিলের মুহূর্তে তাড়াহুড়া করে ওহীর শব্দাবলী পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এমন স্বরণশক্তি দান করবেন যেন ওহী নাযিলের পর আপনি তা ভুলতেই পারবেন না। সুতরাং, এমনি হলো। একদিকে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হতো, অন্য দিকে তা মুখস্থও হয়ে যেত। এই ভাবে মহানবী ﷺ-এর বক্ষদেশ ছিল কুরআন সংরক্ষণের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আধার যেখানে কোন রকমের ভুল-ভ্রান্তি বা রদ-বদলের সম্ভাবনা ছিল না। অতঃপর, বাড়তি সতর্কতাস্বরূপ প্রতি বছর রমজান মাসে তিনি জিব্রাঈল আ.-কে পূর্ণ কুরআন শোনাতেন। যে বছর তাঁর ওফাত হয় সে বছর তিনি জিব্রাঈল আ.-এর সঙ্গে পূর্ণ কুরআন দু'বার শোনান ও শোনেন।[৩]

নবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন কেবল অর্থই শিক্ষা দিতেন না; বরং তাদেরকে শব্দাবলীও মুখস্থ করাতেন। সাহাবায়ে কেরামের অন্তরও কুরআন মাজিদ শেখা ও মুখস্থ করার প্রতি এতটা আগ্রহ ছিল যে এ ব্যাপারে প্রত্যেকের চেষ্টা থাকতো যাতে অন্যদের থেকে অগ্রগামী হতে পারেন। কোনো কোনো নারী তাদের স্বামীদের কাছে মোহরানা হিসেবে কেবল এটাই দাবি করতেন যে তারা তাদেরকে কুরআন মাজীদ শিখাবে। বহু সাহাবী এমন ছিলেন যারা নিজেদেরকে দুনিয়ার সকল চিন্তা ও ঝামেলা থেকে মুক্ত করে কুরআনের জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তারা যে কুরআন মাজীদ কেবল মুখস্থ করতেন তাই নয় বরং রাতভর তারা নামাজে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন।

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন হিযরত করে মক্কা মুকাররামা থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় আসতেন নবী ﷺ তাকে আমাদের কোনো আনসার ব্যক্তির কাছে সমর্পণ করতেন যাতে তিনি তাকে কুরআন শিক্ষা দেন। মসজিদে নববীতে কুরআনের পঠন-পাঠনে এমন শোরগোল হতো যে, রাসূল ﷺ তাদেরকে আওয়াজ ছোট করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হতেন যাতে কোনো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়।[৩]

অল্প কালের মধ্যেই সাহাবায়ে কেরামের এমন একটি বড় দল গড়ে উঠে যাদের সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ ছিল। এ দলের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীন ছাড়া আরও যারা ছিলেন তাদের মধ্যে হযরত তালহা (রাযি.), হযরত সাদ (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত হুযায়ফা ইবনে

---

৩. ৮ বুখারী, ফতহুল বারী

৩. মানাহিরুল ইরফান, ১ম খণ্ড- ২৩৪ পৃ:

ইয়ামান (রা.), হযরত সালিম মাওলা আবি হুজায়ফা (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আমর ইবনে আস (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.), হযরত মু'আবিয়া (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা.), হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.), হযরত হাফসা (রা.), হযরত উম্মে সালামা (রা.) -এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোটকথা, ইসলামের শুরুর দিকে কুরআন মুখস্থ করার প্রতি খুব বেশি জোর দেয়া হয়। সে সময়ের অবস্থা অনুযায়ী এ পদ্ধতিই অধিকতর নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ছিল। কেননা, সে কালে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল অতি অল্প। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশনী, প্রেস ইত্যাদি মাধ্যম ও উপকরণের আবিষ্কারই হয়নি। তখন যদি কেবল লেখার উপর নির্ভর করা হতো তবে বৃহত্তর পরিসরে কুরআন মাজিদের প্রচারও হতো না এবং নির্ভরযোগ্য উপায়ে তার সংরক্ষণও করা যেত না। তার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা আরবিভাষীদেরকে এমন স্মরণশক্তি দান করেছিলেন যে, তাদের এক এক ব্যক্তি হাজার হাজার শ্লোক মুখস্থ জানতো। অতি সাধারণ গ্রাম্যলোকও তার নিজ খান্দানের তো বটেই এমনকি ঘোড়াদের বংশ তালিকা পর্যন্ত মুখস্থ বলতে পারতো। কুরআন মাজিদ সংরক্ষণের জন্য তাদের এই বিস্ময়কর স্মরণশক্তিকেই কাজে লাগানো হয় এবং এরই মাধ্যমে কুরআন মাজিদের সূরার আয়াতসমূহ আরবের কোণে কোণে পৌঁছে যায়।

ওহী লিপিবদ্ধকরণ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরআন মাজিদ মুখস্থ করানো ছাড়াও তা লিপিবদ্ধকরণেরও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, "আমি নবী ﷺ-এর পক্ষে ওহী লিপিবদ্ধকরণের কাজ করতাম। যখন তাঁর ওপর ওহী নাযিল হতো, তাঁর প্রচণ্ড উত্তাপ বোধ হত, তখন তাঁর পবিত্র দেহে শ্বেতবিন্দুসমূহ মুক্তাদানার মতো চকমক করত। তাঁর সে অবস্থা কেটে গেলে আমি (উটের) কাঁধের হাড় বা অন্য কোনো টুকরো নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হতাম। তিনি বলে যেতেন আর আমি লিখতে থাকতাম। লেখা শেষ হলে কুরআন লিপিবদ্ধকরণের গুরুভারে আমার মনে হতো যেন আমার পায়ের গোছা ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং আমি আর কোনো দিন চলাফেরা করতে পারব না। সে যাই হোক, যখন লেখা শেষ করতাম, নবী ﷺ বলতেন, পড়। আমি পড়ে শুনতাম। তাতে কোনো ভূলত্রুটি হয়ে গেলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। তারপর তা মানুষের সামনে নিয়ে আসতেন।"[৩]

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) ছাড়া আরো অনেক সাহাবী ওহী লেখার দায়িত্ব পালন করতেন। যাদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) হযরত মুআবিয়া (রা.) হযরত মুগিরা ইবনে শুবা (রা.) হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) হযরত ছাবেত ইবনুল কায়েছ (রা.) হযরত আবান ইবনে সাঈদ (রা.) প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩]

হযরত উসমান রা. বলেন,"রাসূল ﷺ-এর নিয়ম ছিল, যখন কুরআন মজিদের কোনো অংশ নাজিল হতো তখন ওহী লেখককে বলতেন যে এটুকু অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াতের পর লিখে দাও।"[৩]

সেকালে আরবে কাগজ খুব কমই পাওয়া যেত। তাই, কুরআনী আয়াতসমূহ সাধারণত পাথরের ফলক, চামড়া, খেজুরের ডালা, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা ও পশুর হাঁড়ে লিখে রাখা হতো। তবে, কখনো কখনো কাগজের টুকরোও ব্যবহার করা হয়েছে।[৩]

এভাবে রিসালাতের যুগে স্বয়ং নবী করিম ﷺ এর তত্ত্বাবধানে কুরআন মাজিদের একটি লিপিবদ্ধ কপি তৈরি হয়ে যায়। যদিও তাহা গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত ছিল না; পৃথক পৃথক পত্র-খণ্ড রূপে ছিল। তাছাড়া কোনো কোনো সাহাবী নিজস্ব স্মারক হিসেবে কুরআনী আয়াত নিজের কাছে লিখে রাখতেন। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই এ রীতি চালু ছিল। সুতরাং হযরত উমর (রাযি.) এর ইমলাম গ্রহণের আগে তার বোন ও ভগ্নিপতির কাছে কুরআনী আয়াতের একটি সংকলন ছিল।[৩]

---

১. মাজমাউয যাওয়াইদ-১ম খণ্ড পৃ: ১৫৬ তাবারানী বরাতে
২. ফাতহুল বারী -৯ম খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা ; যাদুল মায়াদ-১ম খণ্ড,৩০ পৃষ্ঠা
৩. ফাতহুল বারী-৯ম খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা
৪. প্রাগুক্ত-৯ম খণ্ড-১১ পৃষ্ঠা
৫. সিরাতে ইবনে হিসাম

হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে কুরআন সংকলন

নবী ﷺ-এর যুগে কুরআন মাজিদের যত কপি তৈরি করা হয়েছিল (তার মধ্যে যেটি পূর্ণাঙ্গ ছিল) তা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জিনিসের মাঝে লিপিবদ্ধ ছিল। কোনো আয়াত চামড়ায়, কোনো আয়াত গাছের পাতায়, হাড়ে বা অন্য কিছুতে লিপিবদ্ধ ছিল। প্রথমে তা পূর্ণাঙ্গ কপিতে ছিল না। কোনো সাহাবীর কাছে একটি সূরা লেখা ছিলো, কোনো সাহাবীর কাছে দশ-পাঁচটি সূরা ছিলো, কোনো সাহাবীর কাছে মাত্র কয়েকটি আয়াত লিপিবদ্ধ ছিলো। আবার, কোনো কোনো সাহাবীর কাছে আয়াতের সঙ্গে ব্যাখ্যামূলক বাক্যও লেখা ছিল।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, অধিক সংখ্যক কোরআনে হাফেজ উক্ত সময়ে বিদ্যমান ছিল। যদিও তা সম্পূর্ণ লিখিত আকারে প্রকাশ হয়নি।

হযরত আবু বকর (রা.) স্বীয় খিলাফত কালে কুরআন মাজিদের বিক্ষিপ্ত অংশসমূহকে একত্র করে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন বোধ করলেন।

তিনি যে প্রেক্ষাপটে যেভাবে এ কাজ আঞ্জাম দিয়ে ছিলেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, "ইয়ামামার যুদ্ধের পরে হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখি, সেখানে হযরত উমর (রা.) উপস্থিত রয়েছেন। আবু বকর (রা.) আমাকে বললেন, এইমাত্র উমর (রা.) এসে আমাকে বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখক কুরআনের হাফেজ শহীদ হয়ে গেছেন। এভাবেই যদি বিভিন্ন স্থানে হাফেজ সাহাবীগণ শাহাদত বরণ করতে থাকেন, তবে আমার আশঙ্কা হয়- কুরআনুল কারিমের একটি বড় অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই, আমার রায় হলো -আপনি কুরআন মাজিদ সংকলনের কাজ শুরু করার আদেশ দিন। আমি উমর (রা.)-কে বললাম, "যে কাজ রাসূল ﷺ করেননি আমরা তা কীভবে করি?" উমর (রা.) উত্তরে বললেন, "আল্লাহ তা'আলার কসম! এটা একটা ভাল কাজই হবে।" অতঃপর উমর (রা.) আমাকে বারবার একথা বলতে লাগলেন। পরিশেষে, আমারও বিষয়টি পুরোপুরি বুঝে এসেছে। এখন আমারও রায় সেটাই যা উমর (রা.) বলেছেন।"

অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে বললেন, "তুমি একজন যুবক পুরুষ এবং বুদ্ধিমান লোক। তোমার সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। তুমি রাসূল ﷺ-এর সম্মুখেও ওহী লেখার কাজ করেছ। সুতরাং, তুমি কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহ খুঁজে খুঁজে সংকলন করে ফেল।"

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলার কসম! তারা যদি আমাকে একটা পাহাড় স্থানান্তরিত করার হুকুম দিতেন, তবে তা আমার কাছে এতটা কঠিন মনে হতো না যতটা মনে হয়েছে কুরআন সংকলনের কাজকে।" আমি তাদেরকে বললাম, যে কাজ রাসূল ﷺ করেননি, আপনারা তা কীভাবে করতে যাচ্ছেন? হযরত আবু বকর বললেন- আল্লাহ তা'আলার কসম! এটি একটি ভালো কাজই হবে। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) বারংবার একথা বলতে থাকলেন। পরিশেষে, আল্লাহ তা'আলা আমার হৃদয়কে হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর রায়ের অনুকূলে খুলে দিলেন। সুতরাং, আমি কুরআনী আয়াতের সন্ধানকার্য শুরু করে দিলাম এবং খেজুরের ডালা, পাথরের ফলক এবং মানুষের স্মৃতিপট থেকে কুরআন মাজীদ একত্র করতে থাকলাম।[৩]

---

৩. বুখারী-ফাজাইলুল কুরআন অধ্যায়

কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে
হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা.-এর কর্মপন্থা

এ স্থলে কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর কর্মপন্থা ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার। পূর্বে বলা হয়েছে, তিনি নিজেও কুরআনের হাফেজ ছিলেন। সুতরাং, পূর্ণ কুরআন তিনি স্মৃতিপট থেকেও লিখে নিতে পারতেন। তিনি ছাড়াও তখন আরও বহু হাফেজ উপস্থিত ছিলেন। আবার, খণ্ড খণ্ড লিখিত আয়াতের ওপরও শুধু নির্ভর করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কোনো একক পন্থাকে বেছে নেন নি, বরং সবগুলো মাধ্যমকে সামনে রেখে তারপর লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো আয়াতের মুতাওয়াতির (অর্থাৎ, যে বিষয়ের ওপর সকলে একমত)হওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আয়াতকে নিজ সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন নি। তাছাড়া, যে সকল আয়াত নবী ﷺ নিজ তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন তা অনেক সাহাবায়ে কেরামের কাছে সংরক্ষিত ছিল। হযরত যায়িদ (রা.) তা খুঁজে খুঁজে একত্র করেন যাতে নতুন সংকলনটি তাঁর অবলম্বনে তৈরি করা যায়। সুতরাং, ঘোষণা করে দেওয়া হয়, যার কাছে কুরআন মাজিদের যে আয়াত লিপিবদ্ধ আছে, সে যেন তা হযরত যায়েদ (রা.)-এর কাছে জমা দেয়। কেউ যখন তার কাছে লিখিত কোনো আয়াত নিয়ে আসত তিনি নিম্নলিখিত চার পন্থায় তা সত্যায়িত করে নিতেন।

১. সর্বপ্রথম নিজ স্মৃতিপটের সাথে তা মিলিয়ে নিতেন।

২. হযরত উমর (রা.)ও কুরআনের হাফেজ ছিলেন। বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় হযরত আবু বকর (রা.) তাকেও যায়েদ (রা.)-এর সহযোগী নিযুক্ত করেছিলেন। কেউ যখন কোনো আয়াত নিয়ে আসতো হযরত যায়েদ (রা.) ও হযরত উমর (রা.) সম্মিলিতভাবে তা গ্রহণ করতেন।[৩]

৩. যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্ভরযোগ্য দুই জন সাক্ষী এই সাক্ষ্য দিত যে, এ আয়াত নবী ﷺ-এর সামনে লেখা হয়েছিলো ততক্ষণ পর্যন্ত লিখিত কোনো আয়াত গ্রহণ করা হতো না।[৩]

---

৩. ফতহুল বারী-৯ম খন্ড ১১পৃ: ইবনে আবু দাউদের বরাতে

৩. আল ইতকান-১ম খণ্ড ৬০ পৃ:

৪. অত:পর লিপিবদ্ধ আয়াতকে সেই সকল সংগ্রহের সাথে মিলিয়ে দেখা হতো যা বিভিন্ন সাহাবী তৈরি করে রেখেছিলেন।[৩]

হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে কুরআন সংকলনঃ

হযরত উসমান (রা.) হিজরী ২৪ সনে খলীফা মনোনীত হন। ইতোমধ্যে ইসলাম আরবের সীমানা অতিক্রম করে রোম ও ইরানের প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। প্রতিটি নতুন অঞ্চল যখন ইসলামে দাখিল হতো তারা মুসলিম মুজাহিদ বা সেই সকল ব্যবসায়ীদের নিকট কুরআন মাজিদের শিক্ষা লাভ করতো, যাদের উসিলায় তারা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। নবী করিম ﷺ-এর নিকট বিভিন্ন সাহাবী বিভিন্ন কেরাত (পাঠরীতি) অনুযায়ী কুরআন শিখেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা পক্ষ থেকে সে সকল কিরাত অনুযায়ী কুরআন পড়ার অনুমতিও তাদের ছিলো। প্রত্যেক সাহাবী তাদের শিষ্যদেরকে সেই পাঠরীতি অনুসারে কুরআন শিক্ষা দিতেন যে রীতিতে তারা রাসূল ﷺ-এর কাছে কুরআন শিখেছিলেন। এভাবে কিরাতের এ বৈচিত্র মুসলিম জাহানের দূর দূরান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। কুরআনুল করিমের বিভিন্ন পাঠরীতি থাকা এবং সবগুলোই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি যতদিন মানুষ অবগত ছিল, তত দিন পর্যন্ত পাঠরীতির বিভিন্নতার কোনো রকম অনিষ্ট দেখা দেয়নি। কিন্তু, এ ভিন্নতা যখন দূর-দূরান্তে পৌঁছে গেল এবং কুরআনের ভিন্ন পাঠরীতি থাকার বিষয়টি সেই সকল এলাকায় প্রসিদ্ধি লাভও করেনি, তখন এ নিয়ে মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব-বিতর্ক দেখা দিতে লাগলো। কেউ নিজের কিরাতকে সহীহ ও অন্য কেরাতকে গলদ বলে আখ্যায়িত করতে লাগল। এ দ্বন্দ্বের কারণে আশঙ্কা ছিলো যে, মানুষ কুরআনের মুতাওয়াতির কিরাতসমূহকে অস্বীকার করার গুরুতর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে পরে। অন্যদিকে, মদিনায় সংরক্ষিত হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) -এর সংকলিত কপি ছাড়া সমগ্র মুসলিম জাহানে এমন কোনো নির্ভরযোগ্য কপি ছিলো না যা সমগ্র উম্মতের জন্য প্রামাণ্যগ্রন্থের মর্যাদা পেতে পাড়ে। কেননা, অন্য যে সকল কপি ছিলো তা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংকলিত ছিলো এবং তাতে সমস্ত নির্ভরযোগ্য কিরাত একত্র করার কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। কাজেই, কিরাতের বৈচিত্রভিত্তিক এ দ্বন্দ্ব নিরসনের

---

৩. আল বুরহান ফী উলুমিল কুরআনকৃত যারকাশী ১ম খণ্ড ২৩৮পৃ:

উপযুক্ত ব্যাবস্থা কেবল এটাই ছিলো যে, যে সংকলনে সমস্ত নির্ভরযোগ্য কিরাত একত্র করা হয়েছে এবং তা দেখে সহীহ ও গলত কিরাত সম্পর্কে ফয়সালা নেয়া সম্ভব সেই সংকলনকে সমগ্র মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে দেয়া হবে। হযরত উসমান (রা.) স্বীয় খিলাফতকালে এ সুমহান কাজেরই আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে হযরত উসমান (রা.) উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.) -কে বলে পাঠালেন যে, আপনার কাছে (আবু বকর রা.-এর প্রস্তুতকৃত) যে সহীফা সংরক্ষিত আছে, তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমরা তার কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করে মূল কপি আপনাকে ফেরত দেব। হযরত হাফসা (রা.) সহীফাখানা হযরত উসমান (রা.) -এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর, হযরত উসমান (রাযি.) চারজন সাহাবাকে দিয়ে একটি পরিষদ গঠন করলেন। এর সদস্য ছিলেন যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.), হযরত সাইদ ইবনুল আস (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হারিছ ইবনে হিশাম (রা.)। তাদের প্রতি দায়িত্ব অর্পিত হলো যে, হযরত আবু বকর (রা.) -এর সংকলন দেখে তারা কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করবেন। উল্লেখিত চার সাহাবীর মধ্যে কেবল যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-ই আনসারী ছিলেন। আর বাকী সকলেই ছিলেন কুরাইশী । তাই, হযরত উসমান (রা.) তাদেরকে বললেন কুরআনের কোনো অংশ যদি তোমাদের ও যায়েদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় (কোনো শব্দ কীভাবে লেখা হবে তা নিয়ে) তবে তা কুরাইশী রীতি অনুযায়ী লিখবে। কেননা, কুরআন মাজীদ তাদের ভাষাতেই নাজিল হয়েছে।

মৌলিক ভাবে তো এ কাজ উপর্যুক্ত ব্যক্তি চতুষ্ঠয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু, পরে অন্যান্য সাহাবীদেরকেও তাদের সহযোগিতায় নিয়োজিত করা হয়েছিল। তারা কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত কার্যের আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগে যে সংকলন তৈরি করা হয়েছিল, তাতে সূরাসমূহ বিন্যস্ত ছিল না। বরং প্রতিটি সূরা আলাদা ভাবে লেখা হয়েছিল। তারা সবগুলো সূরা বিন্যস্ত আকারে একই কপিতে লিপিবদ্ধ করেন।[৩]

২. তারা কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহ এমনভাবে লিখেন যাতে তার লিখনরীতিতে মুতাওয়াতির সবগুলো কেরাত এসে যায়। এ কারণেই তারা তাতে নুকতা ও হরকত লাগাননি, যাতে তা সমস্ত মুতাওয়াতির কিরাআত অনুযায়ী পড়া সম্ভব হয়।[৩]

৩. এ পর্যন্ত সম্মিলিত ভাবে সমগ্র উম্মতের দ্বারা সত্যায়িত। কুরআন মাজিদের পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য কপি ছিল একটিই। এই পরিষদ সুবিন্যস্ত নতুন সংকলনের কয়েকটি কপি তৈরি করলেন সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত উসমান (রা.) পাঁচটি কপি তৈরি করিয়াছিলেন। কিন্তু আবু হাতিম সিজিস্তানী (রহ.)-এর বক্তব্য হলো- সর্বমোট সাতটি কপি তৈরি করা হয়েছিল। তা থেকে একখানি মক্কা মুকার্‌রমায়, একটি শামে, একটি কুফায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট যেটি ছিলো সেটি মদিনা তায়্যিবায় সংরক্ষণ করা হয়।[৩]

আমরা এই আলোচনা দ্বারা জানতে পারলাম কুরআন সংকলনের সঠিক ইতিহাস। খ্রিস্টানদের মনগড়া ব্যাখ্যা সম্পর্কেও জানতে পারলাম। এখানে খ্রিস্টান ভায়েরা যেই দাবি করেছে, তা যে একে বারে ভিত্তিহীন তাও আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়েত দান করুন। আমিন।

---

[৩]. মুস্তাদরাক- ২য় খণ্ড, ২২৯ পৃ:

[৩]. মানাহিলুল ইরফান -১ম খণ্ড, ২৫৩ ও ২৫৪ পৃ:

[৩]. ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড ১৭ পৃ:

রাসূল সা. খাদিজা রা. থেকে তাওরাত শিখেছেন

খ্রিস্টানদের দাবি:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা (রা.) থেকে তাওরাত শিখেছেন এবং সেই অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম আবিষ্কার করেছেন।

তাদের দলিল:

তারা মনগড়া কাহিনী যুক্তি প্রমাণ হিসাবে পেশ করে থাকে। তারা বলে- "নবীজীর প্রথম স্ত্রী বিবি খাদিজা (রা.) ছিলেন একজন ইহুদি ধর্মের মহিলা। তিনি তাওরাত শরিফের মাধ্যমে হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দেয়া ১০টি শরিয়ত বিশ্বাস করতেন। আর নবীজী উপর্যুক্ত নিয়ম-কানুনগুলো দেখিয়া বুঝিয়া অবিভূত হইয়া ছিলেন। যাহা ছিল তাহার নিজের জাতির কুরাইশ বংশ হতে সম্পূর্ণ আলাদা পদ্ধতি। কারণ, কুরাইশ বংশের লোকেরা মূর্তিপূজা করিত, কন্যাসন্তান হইলে জীবিত কবর দিত। এছাড়াও আরো বিভিন্ন অন্যায় কাজ তারা করিত। এই সমস্ত নিয়মের বিরুদ্ধে প্রথমে তিনিই সংগ্রাম শুরু করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত লোকেরা ছিল মক্কা ও এর আশপাশের দেশগুলোতে এবং ইহারা সবাই ছিলেন আরবি ভাষী লোক। -" [১]

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে :

খ্রিস্টানরা বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা (রা.) থেকে তাওরাত শিখেছেন। আর সেই তাওরাতের বাণীর সাথে নিজে ভালো কিছু সংযোগ করে নতুন ধর্মের ঘোষণা দেন। খ্রিস্টানরা এও বলে যে- তিনি এক পাহাড়ে যেতেন, আর সেই পাহাড়ে একজন পাদ্রী ছিল, সেই পাদ্রী যা শিখাতেন সেগুলো নিজের নামে প্রচার করতেন। এর দ্বারা বুঝাতে চায় ইসলাম ধর্ম মূলত খ্রিস্টান পাদ্রীদের থেকেই নেয়া। এটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চতুরতা। (নাউযুবিল্লাহ)

উত্তর :

প্রথমঃ খ্রিস্টানদের এই যুক্তি বা দলিলটি ভিত্তিহীন। এমন ভিত্তিহীন প্রমাণ কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। এগুলো সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাদের বানোনো হাতিয়ার।

আমি খ্রিস্টানভাইদের বলবো, আপনাদের কাছে এর কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থাকলে দেখান। আপনারা পারবেন না। শুধু মানুষকে ধোঁকাই দিতে পারেন। আপনাদের এসব স্বরচিত মিথ্যা কাহিনী আমরা বিশ্বাস করি না।

দ্বিতীয়: কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে। এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ অর্থাৎ, এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। [২]

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন-

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (২৩) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

অর্থঃ এই সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সাথে নাও-এক আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা না পারো -অবশ্যই তা তোমরা কখনোই পারবে না, তাহলে সে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য।[৩]

তৃতীয়: এর পরেও যদি আপনাদের কাছে নিজেদের উদ্ভাবিত কথাকে মিথ্যা বলে মেনে নিতে না পারেন, তাহলেও আপনাদেরকে মুসলমান হতে হবে। কারণ, ঐ পাদ্রী যা শিখিয়েছেন তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচার করেছেন। আপনারা তো পাদ্রীর কথা মানেন। আমি আপনাদের দাওয়াত দিচ্ছি– পাদ্রীর কথা মেনে আপনারা মুসলমান হয়ে

---

১. গুনাহ্গারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ,১১-১২পৃষ্ঠা

২. সূরা আল বাকারা-২

৩. সূরা আল বাকারা-২৩-২৪

যান। দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি পাবেন। বেঁচে যাবেন জাহান্নামের কঠিন আগুন থেকে ইনশাআল্লাহ ।

কুরআন হলো গাইড বই

খ্রিস্টানদের দাবি:

কুরআন হলো গাইড বই, পূর্ববর্তী কিতাবগুলো হলো পাঠ্যবই। তাই, মূলটাকে মানতে হবে।

তাদের দলিল:

দলিল হিসাবে তাদের মনগড়া একটি যুক্তি পেশ করে থাকে।

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে:

"কুরআন শরীফকে বলা হয় কোড অফ লাইফ। জীবন বিধান। আহকাম হুকুম বা গাইড বুক। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন। গাইড বুকের পিছনে আর একটি মূল বুক থাকে, যাকে বলা হয় টেক্সট বুক।" তারা বলতে চায় তাওরাত ও ইঞ্জিল হলো মূল পাঠ্যবই। আর কুরআন হলো গাইড বই। আর মূল বই ছাড়া শুধু গাইড বই নিয়ে চললে হবে না। তাই, তাওরাত ও ইঞ্জিল মানতে হবে।

উত্তর :

আমি খ্রিস্টানভাইদের বলতে চাই, আপনারা কুরআন ছাড়া হাদিসও মানতে চান না। যুক্তি তো পরের কথা। এবার আপনারা যেই যুক্তি দিলেন এটা কুরআনের কোন স্থানে আছে ? কুরআনে নেই। কোথাও নেই। আপনারা মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। এছাড়া যেই তাওরাত-ইঞ্জিলের কথা বলছেন তার আলোচনা বিস্তারিতভাবে পূর্বে গিয়েছে যেগুলো দেখে নিবেন।

এখানে গাইড বললেও জীবন পরিচালনার গাইড পথ দেখাবে।

কুরআন শরীফ হলো কমপ্লিট কোড অফ লাইফ। পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আহকাম হুকুম বা গাইড বুক। তাওরাত ইঞ্জিল যে মূল বই এর প্রমাণই বা কোথায়? মানুষকে বিভ্রান্ত করা থেকে বিরত থাকুন, দু'আ করি আল্লাহ আপনাদেরকে হেদায়াত দান করুন আমিন।

কুরআন না বুঝে পড়লে কোনো লাভ নেই

খ্রিস্টানদের দাবি: আমরা যেহেতু কুরআন বুঝে পড়ি না তাই এই কুরআন আমাদের কোনো উপকারে আসবে না

তাদের দলিল:

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

অর্থঃ তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলি এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই।[৩]

সঠিক ব্যাখ্যা

অর্থাৎ বাছায়ির বলা হয়। ঐ দলিল প্রমাণকে যাকে কুরআন সমর্থন করে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন। [৩]

বায়যাবী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন- যে হক থেকে অন্ধ হয়ে গুমরাহ হয়ে গেল তো তার অশুভ পরিণাম তার উপরই বর্তাবে।[৩].

ইবনে কাসির বলেন- فَمَنْ أَبْصَرَ -দ্বারা উদ্দেশ্য।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়েত দেন সেই হিদায়েত পায়।[৩]

وَمَنْ عَمِيَ-দ্বারা উদ্দেশ্য কেউ যদি হিদায়েত গ্রহণ না করে তার শাস্তি তাকেই পেতে হবে।

---

৩. সূরা আল আন'আম-১০৪

৩. ইবনে জারির খণ্ড ৭-৮ পৃ ৩১৯

৩. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা বায়রুত ১/৩১৫

৩. ইবনে কাসির ২/১৫৪

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ.দ্বারা উদ্দেশ্য আমি তোমাদের হিফাজতকারী নয়, ও তত্ত্বাবধায়ক নয়, বরং আমি একজন প্রচারক মাত্র, আল্লাহ তা'আলা যাকে চান হিদায়েত দেন, এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন।

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে:

উপর্যুক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে, "আল্লাহ তা'আলার কালাম অর্জন করিতে পারিলে আমাদের কল্যাণ হইবে। তাই আমরা যদি আল্লাহ তা'আলার কালাম পড়ি ও বুঝি, তবেই হবে অর্জন। আর অর্জন করিতে পারিলে আমরা আমলও করতে পারিব। যাহা আমাদের জন্য সত্যিকারের কল্যাণ বহিয়া লইয়া আসিবে। সেই জন্য আমাদের বুঝিতে হইবে যদি আমরা কুরআন শরীফের শুধু কয়েকটি আয়াত আরবিতে মুখস্থ করিয়া নামায পড়ি অথচ, যাহা পাঠ করিতেছি তাহার কোনো অর্থই না বুঝি, তাহাতে আমাদের জন্য কি রকম কল্যাণ হইবে। মোটকথা, আমরা যেহেতু কুরআন বুঝে পড়ি না তাই এই কুরআন আমাদের কোনো উপকারে আসিবে না।" [৩]

উত্তর:

১. খ্রিস্টান ভাইকে জিজ্ঞাসা করবো- আপনি যে কুরআনের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, আপনি কি কুরআন বুঝেন? আপনি কি কুরআনের অর্থ জানেন? কুরআন মানেন?

প্রিয় পাঠক! কথায় আছে, 'যার মনে যা, লাফ দিয়ে উঠে তা।' খ্রিস্টান প্রচারকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সেখানে নির্দিষ্ট কিছু আয়াত ও তার কোটেশন মুখস্থ করানো হয়। সেই আয়াতগুলি নিয়েই তারা সরলমনা সাধারণ মুসলমানদের কাছে কুরআনের অপব্যাখ্যা করে । তাদেরকে বিভ্রান্ত করে। তারা আলেমগণের কাছে যায় না। সাধারণ জনগণের কাছে গিয়ে এসব কথা বলে। সাথে বিভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে কুরআনের অপব্যাখ্যা করে। এভাবে মুসলমানদের খ্রিস্টান বানায়। আমি অনেক খ্রিস্টান প্রচারককে বলেছি কুরআন পড়ে অর্থ বলুন। অর্থ বলবে তো দূরের কথা, পড়তেই পারে না। যারা নিজেরাই যা পারে না তারা আবার অন্যকে তারা কিভাবে উপদেশ দেয়?

---

৩. গুনাহ্গারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ -১৪

খ্রিস্টানভাইদের বলতে চাই, আগে আপনি পুরো কুরআন শিখুন। তা নিজে পড়ুন, বুঝুন ও মানুন। এরপর মুসলমানদের বুঝানোর জন্য আসুন। আর পৃথিবীতে এমন উদাহরণ বহু আছে, যারা কুরআনে কি লেখা আছে তা পড়তে বা জানতে গিয়ে সড়ল পথের দিশা পেয়ে গেছেন। সত্যের সন্ধানী হলে ইনশাআল্লাহ আপনিও হেদায়েত পেয়ে যাবেন। আল্লাহর সাথে শিরক করার মহাঅপরাধকৃত পাপ থেকে রক্ষা পাবেন। মুক্তি পাবেন চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে ইনশাল্লাহ। নিজেই বুঝেন না, অন্যজনকে কীভাবে বুঝাবেন? অন্যথায় নিজেও ধোঁকার সাগরে হাবুডুবু খাবেন, অন্যকেও ডুবাবেন। যেমনটি এখানে করলেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে হেদায়াত দান করুন।

২. আপনারা এখানে যে মনগড়া ব্যাখ্যা দিলেন, এটা কুরআনের কোন স্থানে আছে, বলতে পারবেন? পারবেন না। কারণ, এ ধরনের কথা কুরআনের কোথাও নেই। কুরআনের কোনো তাফসীর গ্রন্থে আছে বলতে পারবেন? পারবেন না। কারণ, এ ধরনের কথা কুরআনের তাফসীর গ্রন্থেও নেই।

৩. আপনারা যেই আয়াতটি প্রমাণ হিসেবে পেশ করলেন। সেই আয়াতের সঙ্গে আপনাদের ব্যাখ্যার কোনো মিল নেই। আয়াতটি দলিল দিয়ে যেই ব্যাখ্যা দিলেন এতে আপনারা নিজেদেরকে অজ্ঞ ও মূর্খ প্রমাণ করলেন। যদি প্রথমটি হয়, তাহলে মুসলমান হয়ে কুরআন শিখার চেষ্টা করুন। আর যদি দ্বিতীয়টি হয়, তাহলে মতলববাজী ও বাটপারী পরিত্যাগ করুন। অন্যথায় আপনাকে জ্বলতে হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামের ভীষণ আগুনে।

কুরআন না বুঝে পড়লেও লাভ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলেছেন, যেই ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়বে, সে দশটি করে নেকী পাবে।

খ্রিস্টান ভাইদেরকে বলব, আপনারা কুরআন পড়ুন, বুঝুন, এবং তার উপর আমল করুন। কারণ এই কুরআন আপনাদের জন্যও।

না বুঝিয়া নামায পড়লে দুর্ভোগ হবে

খ্রিস্টানদের দাবি: না বুঝিয়া নামায পড়লে দুর্ভোগ হবে।

তাদের দলিল:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦)

অর্থঃ অতএব, দুর্ভোগ সেসব নামাযীর ৫. যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর, ৬. যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে।[৩]

সঠিক ব্যাখ্যা

فَوَيْلٌ.এর দ্বারা উদ্দেশ্য, এসমস্ত মুনাফিক যারা জনসম্মুখে নামায পড়ে, কিন্তু মানুষের আড়ালে নামায পড়ে না। [৩]

لِلْمُصَلِّينَ. এর দ্বারা উদ্দেশ্য, ঐ সমস্ত মুসল্লি যারা নামায অপরিহার্য করল অতঃপর নামাযের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন করে। অথবা নির্দেশিত বিষয় আদায়ের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করে।

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ.এর ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে, সাধারণ মানুষ যেন মনে করে যে, সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও তাঁর ভয়ে নামায পড়ছে। ঐ ফাসেকের মত, যে নামায পড়ে এই নিয়তে, লোকে যেন তাকে নামাযী বলে।"[৩]

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে

"উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করিয়াছেন আমরা যদি না বুঝিয়া মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত (নামাজ) পড়ি, তাহা হইলে আমাদের দুর্ভোগ হইবে। আর শুধু ঐ নির্দিষ্ট কয়েকটি আয়াতই কি কুরআন শরীফ, আল্লাহ তা'আলার কালাম। সুতরাং, কুরআন শরীফ নিজ নিজ ভাষায় পড়া বুঝা ও কুরআন শরীফের নির্দেশাবলি পালন করাই কি সত্যিকারে কল্যাণকর নহে?" [৩]

উত্তর :

এই আয়াতটি মুলত মুনাফেকদের জন্য । মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য খ্রিস্টানরা এই আয়াত সাধারণ মুসলমানদের ব্যাপারে পেশ করে। মানুষকে বেনামাজী করার জন্য শয়তানের দালালী করছে।

আপনারা যেই ব্যাখ্যা করলেন এই ব্যাখ্যাটি নিতান্ত মনগড়া ও ভুল। খ্রিস্টান প্রচারক ভাইদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা-"আপনি কি আরবি অর্থ বুঝেন? 'না বুঝে নামায পড়লে তার ওপর দুর্ভোগ' একথা উল্লিখিত আয়াতের কোথাও নেই। এই কথাটি আপনাদের নিজেদের থেকে বানিয়ে অপব্যাখ্যা করে মানুষকে ধোঁকা দেন।

খ্রিস্টান প্রচারকের প্রতি আমার প্রশ্ন- "আপনি কি কুরআনের নির্দেশগুলো মানেন? যদি বলেন হ্যাঁ তাহলে আপনি নামাজ পড়েন না কেন? কুরআনের নির্দেশগুলো মানেন না কেন?" ইসলাম গ্রহণ করেন না কেন?

---

৩. সূরা মাঊন-৪-৬

৩. তাফসিরে ইবনে কাসির-২/১৫৪

৩. তাফসিরে কুরতবী ১৯/১৫৩

৩. গুনাহ্গারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ -১৪

জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে কোনো তরিকা মানলেই হবে

খ্রিস্টানদের দাবি: বেহেশ্‌ত যাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন ভিন্ন পথ তৈরী করেছেন। যেকোনো তরিকা মানলেই জান্নাতে যেতে পারবে।

তাদের দলিল:

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ.

অর্থঃ কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্যে একান্তই উত্তম।[১]

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ.এর তাফসিরে বলা হয়েছে–

জান্নাতে যাওয়ার পথ মাত্র একটি আর এই মুত্তাকিদের জন্য তাদের রবের নিকটে রয়েছে মহাপুরস্কার ও চিরস্থায়ী বাসস্থান।[২]

نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. এর ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন, অর্থাৎ মুত্তাকিদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সওয়াব ও উত্তম জীবিকা রয়েছে।[৩]

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে:

বেহেশতে যাইবার জন্য আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন ভিন্ন পথ তৈরী করিয়াছেন উপর্যুক্ত আয়াতের মাধ্যমে আমরা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে বেহেস্তে যাইবার জন্য একটি পথ তৈরী করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তা না করিয়া বরং বিভিন্ন পথ বা তরিকা দিয়েছেন।[৩]

এর দ্বারা খ্রিস্টানগণ বুঝাতে চান ঈসায়ী তরিকা মানলেও জান্নাতে যাওয়া যাবে। তরা মুসলামানদেরকে দাওয়াত দেওয়ার সময় বলে তোমরা পীরদের তরিকা বাদ দিয়ে ঈসার তরিকা গ্রহণ কর।

১নং উত্তর

এখানে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা সম্পুর্ণ ভুল। ব্যাখ্যাটির সাথে আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি খ্রিস্টান প্রচারককে জিজ্ঞাসা করছি- কুরআনে কোথায় আছে যে, যে কোনো পথ বা তরিকা মানলে জান্নাতে যাওয়া যাবে? এ ধরনের কথা কোথাও নেই। বরং বলা হয়েছে ইসলামই একমাত্র পথ যা গ্রহণ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে।

২নং উত্তর

মূলত, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে জান্নাতের নেয়ামতের আলোচনা করেছেন। মুসলমানদের বিভিন্ন গুণের বিনিময়ে বিভিন্ন নেয়ামতের কথা বলেছেন। উপর্যুক্ত আয়াতে মুত্তাকিনদের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। তাদের নেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আবারো খ্রিস্টান প্রচারকদের কাছে আমাদের প্রশ্ন- কুরআনে কি কোথাও খ্রিস্টান বা ঈসায়ী মুসলমানদের জান্নাতে যাওয়ার কথা অথবা তাদের ব্যাপারে জান্নাতের কোনো সুসংবাদ দেওয়া আছে? থাকলে দেখান।

জান্নাতের আলোচনা যত স্থানে আছে সকল স্থানে আছে "মুসলমানদের বা মুমিনদের জন্য"। শুধু মুসলমানগণই জান্নাতে যেতে পারবেন। আর কোনো তরিকার লোক জান্নাতে যেতে পারবে না। জান্নাতে যাওয়ার পথ একটিই। সেটি হলো মুসলমান হওয়া। এবার খ্রিস্টান ভাইদের মুসলমান হতে বলবো। জান্নাতের দাওয়াত দিবো। ইসলাম গ্রহণ করুন, জান্নাতে যেতে পারবেন। ইসলাম গ্রহণ করার লাভ ও ক্ষতি সম্পর্কে কিছু প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করলাম।

মুসলমান হওয়ার লাভ বর্ণনা করা

---

১. সূরা আল ইমরানঃ ১৯৮

২. তাফসিরে কুরতুবী-১৯/১৫৩

৩. তাফসিরে কুরতবী- ২/২৪৬

৩. তরিকুল জান্নাত-১০

ইসলাম গ্রহণ করার সবচাইতে বড় লাভ হল তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যেমন রসুল ﷺ বলেন– الاسلام يهدم ماكان قبله ইসলাম তার পূর্বের সকল পাপকে ক্ষমা করে দেয়।

অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে বে গুনাহ শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে। আরো আপনার জন্য অপেক্ষা করছে চির শান্তির স্থান জান্নাত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থ: শুন যে-কেহ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহার ফল তাহার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোনো ভয় নেই তারা দুঃখিত ও হবে না।[১]

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করাবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী।[২]

ভাই, আপনি যদি মুসলমান না হন তাহলে আপনাকে চিরকালের জন্য নরকের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং জাহান্নামের কঠিন আগুনে জ্বলতে হবে।

২৫। ইসলাম গ্রহণ না করার ক্ষতি

هَـٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ فِى رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

অর্থ: এই দুই বাদী-বিবাদী, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে। অত'এব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে।[৩]

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ

অর্থ: ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে।[৪]

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ

অর্থ: তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি।[৫]

كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ

অর্থ: তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে: দহনশক্তি আস্বাদন কর।[৬]

মোট কথা খ্রিস্টানদের এই দাবিটি নিতান্তই ভুল। জান্নাতে যাওয়ার পথ মাত্র একটিই আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য ধর্ম একটি। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা জান্নাতে যেতে পারবে। তাই আমি খ্রিস্টান ভাইদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি, আপনারা মুসলমান হয়ে যান এবং জান্নাতর পথের পথিক হোন। আল্লাহ তা'আলা আপানাদেরকে হেদায়াত দান করুন।

---

১. বাকারা:১১২
২. সূরা হজ্ব:২২:২৩
৩. সূরা হজ্ব:২২:১৯
৪. সূরা হজ্ব:২২:২০
৫. সূরা হজ্জ-২২:২১
৬. সূরা হজ্জ: ২২:২২

ঈসা আ. একমাত্র মুক্তিদাতা

খ্রিস্টানদের দাবি: ঈসা আ. হলেন একমাত্র মুক্তিদাতা।

তাদের দলিলঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ.

অর্থঃ এই রসূলগণ– আমি তাদের কাউকে কারো ওপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তাঁরা যার সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে প্রকৃষ্ট মুজেযা দান করেছি এবং তাকে শক্তিদান করেছি 'রুহুল-কুদ্দুস' অর্থাৎ, জিবরাঈলের মাধ্যমে। আর আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পয়গম্বরদের পেছনে যারা ছিল তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফের। আর আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো, কিন্ত আল্লাহ তা'আলা তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।[১]

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা :

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ.দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা কিছু রাসূলকে কিছু রাসূলের উপর শেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। [২]

مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলেছেন।[৩]

১. সূরা বাকারা-২৫৩
২. তাফসিরে ইবনে কাসির ১/২৮৬
৩. তাফসিরে ইবনে কাসির ১/২৮৮

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. এর ব্যাপারে হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. বলেন, "ঐ সমস্ত অকাট্য দলিল প্রমাণ যা বিশুদ্ধভাবে পৌঁছে ছিল, যে হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তার রাসূল হিসাবে বনী ইসরাঈলের নিকট এসেছিলেন,[১]

وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাকে হযরত জিব্রাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সাহায্য করেছিলেন।[২]

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ. এর ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসীর বলেছেন, "প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাপের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা যা ফায়সালা করেছেন তাই চূড়ান্ত। এখানে কারো কাট-ছাট করার কোনো অধিকার নেই। অতএব, আল্লাহ তা'আলা যাকে তৌফিক দিয়েছেন সেই হিদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে।"[৩]

যেভাবে অপব্যখ্যা করেঃ

"উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মরিয়ামের গর্ভের সন্তানের নাম হবে ঈসা মসিহ। এই নাম কোনো মানুষের দেয়া নাম নয়, আল্লাহ তা'আলা নিজে এই নাম দিয়েছেন। আমরা কিতাব থেকে জানতে পারি যে, অধিকাংশ নবীদের নামই আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। আমরা যদি ঈসা মসিহের নামের তাৎপর্য দেখি, তাহা হইলে দেখিব যে,'ঈসা' শব্দের অর্থ হইল মুক্তিদাতা, পরিত্রাণকর্তা বা নাজাতদাতা। আর 'মসিহ' শব্দের অর্থ হইল , অভিষেকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা মনোনীত ব্যক্তি, অর্থাৎ মানব জাতিকে গুনাহ থেকে মুক্ত করিবার জন্য যাহাকে মনোনীত করা হইয়াছে।"

পবিত্র কুরআন শরীফের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে হযরত ঈসা মসিহকে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানেই সম্মানিত বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। শুধু তাহা নহে, তাহাকে সম্মানের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার পাশে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। আরো বলা হইয়াছে যে, তাহাকে পবিত্র

১. রুহুল মাআনী-২/৪, ইবনে কাসির-১/২৮৮
২. ইবনে জারির-৩/৩,ইবনে কাসির-১/২৮৮
৩. ইবনে কাসির-১/২৮৮,ইবনে জারির-২/৪

আত্মা দ্বারা শক্তিশালী করা হইয়াছে, আর পবিত্র আত্মা দ্বারা শাক্তশালী করা হলে তিনি কোনো গুনাহ করিতে পারিবে না।

অন্যদিকে, হযরত আদম আ.-কে যদি আল্লাহ তা'আলা পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিশালী করিতেন তাহা হইলে তিনি গুনাহ করিতে পারিতেন না। আর আমরাও গুনাহগার হইতাম না। তারপর বলা হইয়াছে- হযরত ঈসা মসিহকে সুস্পষ্ট দলিল দেওয়া হইয়াছে, সুস্পষ্ট অর্থাৎ যে কিতাবে কোনো ভুল নাই, আর সেই কিতাবের নাম হইল ইঞ্জিল শরীফ। অনেকে আছেন এই কিতাব কখনও দেখেনও নাই বা পড়েনও নাই।"[৩]

উত্তরঃ

এখানে খ্রিস্টান ভাইয়েরা অনেকগুলো বিষয় উল্লেখ করেছেন। আমি প্রতিটি বিষয় স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো ইন্‌শাআল্লাহ তা'আলা ।

"ঈসা মসিহ"- শব্দের অর্থ:

খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের খ্রিস্টান বানানোর জন্য অনেক কলা-কৌশল অবলম্বন করেন। সেগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম একটি কৌশল। তারা বলে 'ঈসা' শব্দের অর্থ নাজাতদাতা, মুক্তিদাতা, পরিত্রাণদাতা। আমি খ্রিস্টান ভাইদের বলব, এই অর্থটি কোন্ অভিধানে আছে? 'ঈসা' শব্দটি আরবি। আরবি কোনো অভিধানে 'ঈসা' শব্দের অর্থ 'নাজাতদাতা' নেই। এটা খ্রিস্টানগণ তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে মনগড়া ও মিথ্যা এই অর্থ করে থাকেন।

'মসিহ' শব্দের অর্থ বলা হয়েছে 'মনোনীত ব্যক্তি'। এটাও একই কোনো আরবি অভিধানে লেখা নেই, 'মসিহ' শব্দের অর্থ 'মনোনীত'- এটাও তাদের মনগড়া বানানো অর্থ।

আমি খ্রিস্টানভাইকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনারা মুসলমানদের খ্রিস্টান বানানোর জন্য কুরআন দিয়ে প্রমাণিত করতে চান। হাদীস-তাফসীর মানেন না। আচ্ছা বলুন তো, কুরআনের কোন্ স্থানে আছে 'ঈসা' শব্দের অর্থ 'নাজাতদাতা'? 'মসিহ' শব্দের অর্থ 'মুক্তিদাতা' অর্থাৎ 'গুনাহ থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করার জন্য মনোনীত করা হইয়াছে'? আমি খ্রিস্টান প্রচারককে বলবো, 'অর্থাৎ' বলে আপনি যেই ব্যাখ্যাটি করলেন এটা কুরআনের কোন স্থানে আছে? আমরা মুসলমান। কুরআন-হাদীস ছাড়া আপনাদের মনগড়া কথা বিশ্বাস করবো না। এখন বলতে পারেন, বাইবেলে আছে। তাহলে বলবো, আমরা হলাম মুসলমান। আপনাদের বাইবেল, তথাকথিত ইঞ্জিল বা কিতাবুল মুকাদ্দাসকে আল্লাহ তা'আলার কালাম বলে বিশ্বাসই করি না। কারণ, এগুলো হলো মানব রচিত গ্রন্থ। কীভাবেই আবার আল্লাহ তা'আলার কালাম হতে পারে? আপনারা বাইবেল দিয়ে প্রমাণ দিলেও সেটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রচারক সাহেব, বলুন তো ইঞ্জিল কি কোনো ডিকশনারি যার মধ্যে 'ঈসা' ও 'মসিহ' অর্থ লেখা আছে? আবার আল্লাহ তা'আলা কি এমন হতে পারেন যিনি একজনের নাম ও উপাধির অর্থ মানবজাতির বিধান গ্রন্থে ওহী হিসেবে পাঠাবেন?

এমন কি হতে পারে? যে, আল্লাহ তা'আলা এই দুইটি শব্দের অর্থ বললেন? বাকিগুলোর অর্থ বললেন না ?

এরপরেও কি কারো বুঝতে বাকি থাকতে পারে যে, আপনারা অবশ্যই ইঞ্জিলে এই শব্দগুলো যোগ করেছেন?

৩. গুনাহ্গারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ -২৩

২নং প্রশ্নের উত্তর

আপনারা লিখেছেন- পবিত্র কুরআন শরীফের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা মসিহকে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানেই সম্মানিত বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহাকে সম্মানের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার পাশে বসাইয়াও রাখা হইয়াছে"।

এটা কেমন মিথ্যাচার আর ধোঁকাবাজি! এখানে খ্রিস্টানগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিতান্তই বানোয়াট। কারণ, তারা বলছে উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে, এ কথাগুলো বলে যেই দাবিগুলো করল উল্লিখিত আয়াতে এর নাম গন্ধও নেই। কুরআনে কোথাও নেই 'ঈসা আ.-কে আল্লাহ তা'আলার পাশে বসিয়ে রেখেছেন।' কুরআনের আয়াত বলে কুরআনের সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকা সাধারণ মানুষের কাছে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে খ্রিস্টান বানাচ্ছে। আমি খ্রিস্টান ভাইদের বলবো, আপনাদের সাহস থাকলে কুরআন ছাড়া শুধু আপনাদের বাইবেল দ্বারা প্রমাণিত করুন যে, আপনাদের ধর্ম সত্য। আপনারা তা কখনোই পারবেন না। কারণ, আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো হলো বানানো। তা দ্বারা আপনাদের ধর্মকে সত্য বলে প্রমাণিত করা অসম্ভব। আলহাম্‌দুলিল্লাহ । আমাদের ধর্মকে সত্য প্রমাণিত করতে অন্য কোনো ধর্মীয় গ্রন্থের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। কুরআনই যথেষ্ঠ।

৩নং উত্তর

আরো বলা হইয়াছে- "তাহাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিশালী করা হইয়াছে। আর পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিশালী করা হইলে তিনি কোনো গুনাহ করিতে পারিবেন না।"

এ ধরনের কথা বলে খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের ধোঁকা দিতে থাকেন। আমরা মুসলমানগণ বিশ্বাস করি সকল নবী নিষ্পাপ। কিন্তু খ্রিস্টানগণ ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়া সকল নবীকে পাপী মনে করেন । অথচ খ্রিস্টানদের বাইবেলই প্রমাণ করে- ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাপী ছিলেন। নাঊযুবিল্লাহ। তার কিছু প্রমাণ নিম্নে পেশ করলাম।

'যিশু পাপী' -বাইবেলের সাক্ষী:

বাইবেলেই এ কথা প্রমাণ করে যে, যীশু পাপী।

১. তিনি অনেকগুলো নিরপরাধী পশুকে হত্যা করেছেন। নিরপরাধ পশুকে হত্যা করা পাপ। তাই, খ্রিস্টানদের যীশু পাপী।

দেখুন, বাইবেল কী বলে-

"পরে যীশু সাগরের অন্য পাড়ে গাদারীয়দের এলাকায় গেলেন। তখন মন্দ আত্মায় পাওয়া দু'জন লোক কবরস্থান থেকে বের হয়ে তাঁর কাছে আসল। তারা এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে কেউই সেই পথ দিয়ে যেতে পারতো না। তারা চিৎকার করে বললো,"হে ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের সঙ্গে আপনার কী দরকার? সময় না হতেই আপনি আমাদের যন্ত্রণা দিতে এখানে এসেছেন?" তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু দূরে খুব বড় এক পাল শূকর চড়ে বেড়াচ্ছিল। মন্দ আত্মারা যীশুকে অনুরোধ করে বলল, "আপনি যদি আমাদের দূর করেই দিতে চান তবে ঐ শুকরের পালের মধ্যেই পাঠিয়ে দিন।" যীশু তাদের বললেন, "তা-ই যাও।" তখন তারা বের হয়ে শূকরগুলোর মধ্যে গেল। তাতে সেই শূকরের পাল ঢালু পার দিয়ে দৌড়ে গেল এবং সাগরের জলে ডুবে মরলো।[৩]

২. তিনি ডুমুর গাছ কেটে ফেললেন।। অসময়ে গিয়ে ডুমুর গাছে ফল চাইলেন, ফল না দিতে পারায় গাছটিকে অভিশাপ দিলেন। ফলে গাছটি মারা গেল। [৩]এসব আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো বাইবেল অনুযায়ী যীশুও পাপী, আর পাপী ব্যক্তি অন্য পাপীকে মুক্তি দিতে পারবে না। সে অনুযায়ী যীশুও কাউকে মুক্তি দিতে পারবে না। এখন আপনাদের মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। কারণ, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ইসলাম পূর্বের সকল পাপকে ক্ষমা করে দেয়। আমরা সকলেই আল্লাহ তা'আলাকে পেতে চাই। আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার পথ কখনও নবী ব্যতীত মানুষের দেখানো পথ হতে পারে না। আপনাদের সাধু পৌল নিষ্পাপ নবীকেও পাপী বানিয়েছে। সাধু পৌলকে কেন্দ্র করে কয়েক কোটি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। তারপরেও আপনারা সাধু পৌলের মতো খলনায়ককে সাধু আখ্যা দিয়ে বিকৃত বাইবেলকেই মুক্তির গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার পথ হল সকল ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের শেষ নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা। আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসবেন এবং সকল পাপকে মা'ফ করে দিবেন। উক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল নাজাত পেতে হলে মুসলমান হতে হবে। আমি আপনাদেরকে নাজাতের পথ ইসলামের দিকে আহ্বান করছি।

---

৩. মথি-৮ঃ ২৮-৩২

৩. মার্ক-১১:১৩-১৪

ঈসা আ.কে পাপে ফেলানোর চেষ্টা

মরু এলাকায় চল্লিশদিন ধরিয়া শয়তান ঈসাকে লোভ দেখাইয়া পাপে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।[৩]

শয়তান ঈসা আ.কে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যেত, একবার শয়তান তাহাকে খুব উচু একটা পাহাড়ে লইয়া গেল এবং দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য ও জাক জমক দেখাইয়া বলিল, তুমি যদি আমাকে সেজদা কর, তবে এই সমস্তই আমি তোমাকে দিব। তখন ঈসা তাহাকে বলিলেন, দূর হও, শয়তান! পাককিতাবে লেখা আছে- প্রভু, যিনি তোমার খোদা, তাহাকে তুমি সেজদা করিবে, কেবল তাহারই সেবা করিবে।[৩] খ্রিস্টধর্মের দাবি অনুসারে ঈসা হলেন নিজেই খোদা। তাহলে প্রশ্ন উঠে- শয়তান কি করে খোদাকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যেতে পারে? অভিশপ্ত শয়তান কেমন করে মহাপ্রভু খোদাকে নিয়ন্ত্রন করে? খোদা তো কারো নিয়ন্ত্রনের অধীন নয়।

---

৩ মার্ক-১:১৩

৩ মথি-৪:৮-১০

বাইবেলে স্ববিরোধ

বাইবেলে অগণিত বৈপরীত্য, ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতিতে ভরা। এখানে বহু বৈপরিত্যের মধ্যে মাত্র কয়েকটি পাঠকদের খেদমতে পেশ করলাম।

১. বিন্যামীনের সন্তানদের নাম ও সংখ্যায় বৈপরীত্য

১ বংশাবলির (বংশাবলি ১ম খণ্ড) ৭ম অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে বলা হয়েছে: "বিন্যামীনের সন্তান- বেলা, বেখর ও যিদীয়েল, তিন জন।"

পক্ষান্তরে, ১বংশাবলিরই ৮ম অধ্যায়ের ১শ্লোকে বলা হয়েছে: বিন্যামীনের জেষ্ঠ্য পুত্র বেলা, দ্বিতীয় অস্‌বেল, তৃতীয় অহর্হ, চতুর্থ নোহা ও পঞ্চম রাফা।"

কিন্তু আদিপুস্তক ৪৬ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে বলা হয়েছে: "বিন্যামীনের পুত্র বেলা, বেখর, অস্‌বেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুপ্‌পীম, হুপ্‌পীম ও অর্দ।"

তাহলে বিন্যামীনের সন্তান সংখ্যা প্রথম বক্তব্যে তিন জন এবং দ্বিতীয় বক্তব্যে ৫ জন। তাদের নামের বর্ণনাও পরস্পর বিরোধী, শুধু বেলার নামটি উভয় শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, বাকিদের নাম সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর তৃতীয় শ্লোকে বিন্যামীনের সন্তান সংখ্যা ১০জন। নামগুলি আলাদা। তৃতীয় শ্লোকের নামগুলির সাথে প্রথম শ্লোকের সাথে দুজনের নামের এবং দ্বিতীয় শ্লোকের দু'জনের নামের মিল আছে। আর তিনটি শ্লোকের মিল আছে একমাত্র 'বেলা' নামটি উল্লেখের ক্ষেত্রে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকদ্বয় একই পুস্তকের। উভয় পুস্তকের লেখক ইয়্রা ভাববাদী। এভাবে একই লেখকের লেখা একই পুস্তকের দু'টি বক্তব্য পরস্পর বিরোধী বলে প্রমাণিত হলো। আবার তাওরাতের আদিপুস্তকের বক্তব্যের সাথে ইয়্রার দু'টি বক্তব্যেও বৈপরীত্য প্রমাণিত হলো। স্পষ্ট পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ইহূদী ও খ্রিস্টান পণ্ডিতগণকে হতবাক করে দিয়েছে। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে ইয়্রাই ভুল করেছেন। এ ভুলের কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন যে, ইয়্রা পুত্র ও পৌত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি এবং যে বংশতালিকা দেখে তিনি বংশাবলির এই তালিকা লিখেছেন সেই মূল বংশতালিকাটি ছিল অসম্পূর্ণ।

২. ইস্রায়েল ও যিহূদা রাজ্যের সৈনিকদের সংখ্যার বৈপরীত্য

শামূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকটি নিম্নরূপ:"পরে যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা রাজার কাছে দিলেন; ইস্রায়েলে খড়্গ-ধারী আট লক্ষ বলবান লোক ছিল; আর যিহূদার পাঁচ লক্ষ লোক ছিল।"

অপর দিকে বংশাবলি প্রথম খণ্ডের ২১ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক নিম্নরূপ: "আর যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা দায়ূদের কাছে দিলেন। সমস্ত ইস্রায়েলের এগার লক্ষ খড়্গধারী লোক ও যিহূদার চারি লক্ষ সত্তর সহস্র খড়্গধারী লোক ছিল।"

তাহলে প্রথম বর্ণনামতে ইস্রায়েলের যোদ্ধাসংখ্যা ৮,০০,০০০ এবং যিহূদার ৫,০০,০০০। আর দ্বিতীয় বর্ণনামতে তাদের সংখ্যা: ১১,০০,০০০ ও ৪,৭০,০০০। উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্যের পরিমাণ দেখুন! ইস্রায়েলের জনসংখ্যার বর্ণনায় ৩ লক্ষ্য কমবেশি এবং যিহূদার জনসংখ্যার বর্ণনায় ত্রিশ হাজারের কমবেশি।

বাইবেল ভাষ্যকার আদম ক্লার্ক তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে কোনটি সঠিক তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। বস্তুত বাইবেলের ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকগুলিতে ব্যাপক বিকৃতি ঘটেছে এবং এ বিষয়ে সমন্বয়ের চেষ্টা অবান্তর। বিকৃতি মেনে নেওয়াই উত্তম; কারণ তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং বাইবেলের বর্ণনাকারী ও লিপিকারগণ ইলহাম-প্রাপ্ত বা ঐশী প্রেরণাপ্রাপ্ত ছিলেন না।

৩. অহসিয় রাজার রাজ্যগ্রহণকালীন বয়স বর্ণনায় বৈপরীত্য:

রাজাবলি দ্বিতীয় খণ্ডের ৮ম অধ্যায়ের ২৬ শ্লোক নিম্নরূপ: "অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং যিরূশালেমে এক বৎসরকাল রাজত্ব করেন।" বরং ২ বাংশাবলীর ২২:২ এ আছে অহসিয় ৪২ বছর বয়সে রাজ্যগ্রহণ করেন। উভয় বর্ণনার মধ্যে মাত্র ২০ বৎসরের বৈপরীত্য!

দ্বিতীয় তথ্যটি সন্দেহাতীতভাবে ভুল; কারণ, ২ বংশাবলি দ্বিতীয় খণ্ডের ২১ অধ্যায়ের ২০ শ্লোক এবং ২২ অধ্যায়ের ১-২ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অহসিয়ের পিতা যিহোরাম ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার মৃত্যুর পরপরই অহসিয় রাজ-সিংহাসনে বসেন। এখন যদি দ্বিতীয় তথ্যটি নির্ভুল হয় তাহলে প্রমাণিত হয় যে, অহসিয় তার পিতার চেয়েও দুই বছরের বড় ছিলেন! আর এ যে অসম্ভব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য আদম ক্লার্ক, হর্ন, হেনরি ও স্কট তাদের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে স্বীকার করেছেন যে, বাইবেল লেখকের ভুলের কারণে এ বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে।

৪. সুলাইমান আ.-এর অশ্বশালার সংখ্যা বর্ণনায় বৈপরীত্ব:

১ রজাবলির ৪র্থ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "শলোমনের রথের নিমিত্তে চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারোহী ছিল।"

এর বিপরীতে ২ বংশাবলির ৯ম অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকটিতে আছে: "শলোমনের চারি সহস্র অশ্বশালা ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল।"

এখানে, উভয় বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। প্রথম শ্লোকে দ্বিতীয় শ্লোকের চেয়ে ৩৬,০০০ বেশি অশ্বশালার কথা বলা হয়েছে।

বাইবেল ভাষ্যকার আদম ক্লার্ক বলেন, "সংখ্যাটির উল্লেখের ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটেছে বলে স্বীকার করে নেওয়াই আমাদের জন্য উত্তম।"

৫. যীশুর আগমন শান্তি না অশান্তির জন্য?

মথি ৫/৯ঃ "ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।"

লূক ৯:৫৬ঃ "কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণনাশ করিতে আসেন নাই; কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।"

মথি ১০:৩৪ঃ " মনে করিও না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি।

লূক ১২:৪৯ ও ৫১ঃ "(৪৯) আমি পৃথিবীতে অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি; আর এখন যদি তাহা প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তবে আর চাই কি?...(৫১) তোমরা কি মনে করিতেছ, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি? তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা নয়, বরং বিভেদ সৃষ্টি করিতে আসিয়াছি।"

উপরের বক্তব্যগুলির মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। প্রথম দুটি বক্তব্যে, ঐক্য ও মিলন সৃষ্টিকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং যে যীশু নিজেও ধ্বংস নয়, বরং রক্ষা করতে আগমন করেন। কিন্তু শেষ দুটি বক্তব্যে সম্পূর্ণ বিপরীত

কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে- তিনি খড়্গ, হানাহানি, ধ্বংস ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য আগমন করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, আপনাদের বাইবেল অনুসারে তিনি মুক্তি, শান্তি, মিলন ও রক্ষার জন্য আগমন করেননি; কাজেই যাদেরকে ধন্য বলা হবে এবং ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

এখানে অল্প কয়েকটি বৈপরীত্য উল্লেখ করা হল এধরনের স্ববিরোধে ভরা যেই গ্রন্থে থাকে সেটা আবার আল্লাহ তা'আলারকালাম হয় কীভাবে? এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় এটা আল্লাহ তা'আলার কালাম নয়।

এবং ইসা আ: মুক্তিদাতা নয় বরং মুক্তিদাতা হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টান ভাইদেকে সঠিক বুঝ দান করুন। হেদায়াত দান করুন। ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

ঈসা আ. নিজেই আল্লাহ

খ্রিস্টানদের দাবি: ঈসা আ. নিজেই আল্লাহ।

প্রমাণ:

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

আর বনী-ইসরাঈলদের জন্যে রাসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন: নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায়-আল্লাহ তা'আলার হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই-যা তোমরা খেয়ে আসো এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আসো। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।[৩]

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ.

কোনো ঘোষণাকারী তাদের জন্য ঘোষণা করেছে।[৩]

قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ.

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. লিখেছেন যে, "হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে তাতে ফুঁক দিতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তা পাখির ন্যায় উড়তো, যিনি এটাকে

[৩] সুরা বাকারা-৪৮

[৩]. ইবনে কাসির -১৩/৪৪

হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মু'জিযা বানিয়েছেন। আর এ মু'জিযা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন।"[৩]

وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ.এর ব্যাখ্যায়

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. লিখেছেন, "আকামাহা বলা হয়, যে জন্মান্ধ আর এটা অধিক অনুকুলীয় অর্থ কেননা মু'জিযার ক্ষেত্রে এটা অধিক প্রযোজ্য এবং চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী।" [৩]

وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ এই ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর রহ: বলেছেন, যে অনেক আলেম বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে সমকালীন লোকদের চেয়ে জ্ঞানে পারদর্শী করে পাঠিয়েছেন। তেমনি ভাবে হযরত ঈসা আ. কে ডাক্তারী বিদ্যাও প্রকৃতিক বিদ্যা দিয়ে পাঠিয়েছেন। অতপর তিনি তাঁর কওমের নিকট এমন জ্ঞান ও নিদর্শণ নিয়ে আসলেন যেই জ্ঞান ও নিদর্শণ তাদের কারো নিকট নেই। তবে হযরত ঈসা আ:কে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে সাহায্য করা হয়েছে। কোনো ডাক্তারের কি ক্ষমতা আছে যে, নিষ্প্রাণ বস্তুকে প্রাণ দিবে? অথবা জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে তুলবে? এবং যারা কবরে শায়িত আছে তাদেরকে জীবিত করবে? ঈসা আ. মৃত্যু বাক্তিকে জীবিত করার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতেন। আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করছেন। আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারতেন। জন্মান্ধের চোখে হাত দিলে তা ভালো হয়ে যেত। রোগীর গায়ে হাত দিলে রোগী ভালো হয়ে যেত।[৩]

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে তাঁর প্রত্যেকটির মধ্যে।[৩]

যেভাবে অপব্যাখ্যা করে

আমরা প্রত্যেক মুসলমান ভাই-বোনই এ কথা জানি যে, হায়াত (অর্থাৎ আমাদের আয়ু), মউত (অর্থাৎ আমাদের মৃত্যু), রিজিক (অর্থাৎ আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য) এবং দৌলত (অর্থাৎ আমাদের জমাকৃত সম্পদ) আল্লাহ তা'আলার হাতে। আমি বিশ্বাস করি ইহাতে আমাদের কাহারো কোনো সন্দেহ নাই। আর উপরে উল্লিখিত আয়াত অনুসারে আমরা দেখি যে, উক্ত ক্ষমতাসমূহ আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা মসিহকে দিয়েছেন। শুধু যে দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে কিন্তু বলা হইয়াছে, তোমরা বিশ্বাসী হইলে ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে। অর্থাৎ আমরা যদি তাহার ওপর ঈমান আনি তাহা হইলে নিদর্শন অর্থাৎ চিহ্ন দেখিতে পাইব। অর্থাৎ হায়াত, মউত, দৌলত যদি আল্লাহ তা'আলার হাতে রেখে থাকেন আর কাউকে না দিয়া থাকেন, তবে প্রশ্ন হল ঈসা আ.-কে? যে ঐ সমস্ত কার্য করিতেছেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলেন না। তাহা হইলে কথাটি দাঁড়াল কি ঈসা আ.-ই আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ)। যদিও ঈসা আ.-কে আল্লাহ বলার দরকার নেই। বরফের মধ্যে যেমন পানি আছে আমরা সবাই জানি কিন্তু কখনোই আমরা বরফকে পানি বলি না, ঠিক তেমনি ঈসা আ.-কে আমরা সম্মানসূচক আল্লাহর পুত্র বলে ডাকি। আমরা যদি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করি কুরআন শরীফে আসমান ও দুনিয়ার সমস্ত সুন্দর সুন্দর নাম আল্লাহ তা'আলার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আমাদের মনে রাখা উচিত, পিতা ও পুত্রের মত গভীর সম্পর্ক অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

পিতারও যেই কাজ পুত্রেরও সেই কাজ। এর প্রমাণ স্বয়ং ইঞ্জিল শরীফে । ইউহোন্না ৫ঃ১৬-২৩ আয়াত-"বিশ্রামবারে ঈসা এইসব কাজ করছিলেন বলে ইহুদী নেতারা তাঁকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করলেন। তখন তিনি সেই নেতাদের বললেন, আমার পিতা সব সময় কাজ করছেন এবং আমিও করছি।" পিতা যেমন মৃতকে জীবন দিয়ে উঠান ঠিক তেমনি পুত্রও যাকে ইচ্ছা করেন তাকে জীবন দান করেন। পিতা কারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার পুত্রকে দিয়েছেন যেন পিতাকে যেমন সবাই সম্মান করে তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে।

আমাদের মনে রাখা উচিত, আল্লাহ তা'আলা বহু নামের মধ্যে বিরাজমান। তার মানে এই নয় যে, আমরা বহু আল্লাহতে বিশ্বাস করি। যেমন, আমরা যদি একটি কেটলিতে পানি নেই এবং জ্বাল দিতে থাকি, তবে পানি বাষ্প হয়ে বেড় হয়ে আসতে থাকবে, এখন আমি যদি কেটলির নলের সামনে একটি ঠাণ্ডা পাত্র রাখি তবে বাষ্প টপ টপ করে পানি আকারে

---

৩. ইবনে জারির ৩-৪/ ৩০০, ইবনে কাসির -১/৩৪৪

৩. ইবনে জারির ৩-৪/ ৩০১, ইবনে কাসির -১/৩৪৪, রুহুল মাআনী-২/৬৩

৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর-১/৩৪৫, ইবনে জারির-৩-৪/৩০২,

৩. (ইবনে কসীর ১/২৩৪, ইবনে জারির-৩-৪/৩০৫)

পাত্রে জমা হবে এবং ঐ পানি যদি ফ্রিজের ভিতর রাখা হয় তবে তা বরফ হয়ে যাবে। এখন আমরা যদি বাষ্প দেখিয়ে কাউকে বলি আপনি জানেন এগুলি বাষ্প তখন তিনি আমার সঙ্গে একমত হবেন ঝগড়া করবেন না, ঠিক একই রকম বরফ দেখিয়ে যদি বলি এগুলি বরফ, তখনও তিনি আমার সঙ্গে এক মত হবেন, কিন্তু আমি যদি বাষ্প দেখিলে বলি জানেন এগুলি পানি, তবে তিনি বলবেন, "পাগল"। ঠিক একইভাবে বরফ দেখিয়ে যদি বলি এটি পানি তখনও সে আমাকে বলবে পাগল। লক্ষ্য করুন- ঐ পানি, বাষ্প ও বরফ কিন্তু একই বস্তু। পানিতে তার গুণগত কোনো পারিবর্তন হয় নাই শুধু অবস্থানগত পরিবর্তন হয়েছে এবং তার আলাদা আলাদা নামকরণ হয়েছে। ঠিক একইভাবে অনেক নামের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিরাজ করেন কিন্তু তাঁর গুণগত কোনো পরিবর্তন হয় না। শুধু তাঁর অবস্থান অনুসারে নামকরণ হয় যেমন- আমরা যখন মনে করি আল্লাহ তা'আলা উপরে রয়েছেন এবং ওখান থেকেই আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন তখন তাঁর নাম আল্লাহ। যখন পাক রুহের শক্তিতে কুমারী মরিয়মের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে এই দুনিয়াতে আসলেন তখন তার নামকরণ করা হয়েছে 'ইবনুল্লাহ' বা আল্লাহ তা'আলার রুহানি পুত্র বা ঈসা মসিহ। তাই আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তা'আলা যা করতে পারেন ঈসা আ. তাই করতে পারেন(নাউযুবিল্লাহ)। তাঁর গুণগত কোন পরিবর্তন হয় নাই। যেমন হায়াত, মউত, রিজিক, দৌলত আল্লাহ তা'আলা যা দান করতে পারেন ঠিক তেমনি ঈসা আ. ও পারতেন (নাউযুবিল্লাহ)। দলিল হিসাবে পূর্বোক্ত উল্লিখিত সূরা আল ইমরানের ৪৯নং আয়াতকে পেশ করে।

মোটকথা, এই বিস্তারিত প্রমাণাদির সার কথা হলো ৬টি।

১. বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে যীশুর ক্ষেত্রে ঈশ্বরের পুত্র কথাটি প্রয়োগ।

২. নতুন নিয়মের কিছু শ্লোকে যীশুকে এ জগতের নন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. যীশু নিজেকে ঈশ্বরের সাথে এক বলে উল্লেখ করেছেন।

৪. যীশুকে দেখলেই ঈশ্বরকে দেখা হবে বলে যীশুর বক্তব্য।

৫. কুরআনের কিছু আয়াত।

৬. একটি যুক্তি।

উত্তর:

আয়াতের ব্যাখ্যা

প্রথমত, এটা কতবড় ভণ্ডামি আর জালিয়াতি। এর থেকে বড় কোনো জুলুম হতেই পারে না। খ্রিস্টানগণ এখানে আয়াত আনলেন একটি কিন্তু এই আয়াত দ্বারা যেসব জিনিস প্রমাণিত করেছেন তার নাম-গন্ধও এখানে নেই।

এ পর্যায়ে তাদের বক্তব্যের অসারতাগুলো বিস্তারিতভাবে পাঠকের খেদমতে পেশ করছি।

যীশুর ঈশ্বরত্বের প্রমাণাদির অসারতা

সুমাচারগুলির কিছু বক্তব্যকে, বিশেষত যোহনলিখিত সুসমাচারের কিছু বক্তব্যকে খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। ইনশাআল্লাহ,এখানে আমরা তাদের এ সকল প্রমাণগুলি উল্লেখ করে তার অসারতা প্রমাণ করব।

প্রথম প্রমাণ: যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণের পেশকৃত প্রথম যুক্তি- বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে যীশুর ক্ষেত্রে 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটির প্রয়োগ।[৩]

দু'টি কারণে এ প্রমাণটি বাতিল:

এক. এছাড়া, মথির ১:১-১৭ ও লূকের ৩/২৩-৩৪ শ্লোকে যীশুর বংশতালিকা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে তাকে দায়ূদের বংশধর ও দায়ূদের মাধ্যমে ইয়াকুব, ইসহাক ও ইব্রাহীমের বংশধর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল স্বভাববাদী সকলেই আদম সন্তান বা মানব সন্তান ও মানুষ ছিলেন। তাঁদের বংশধর যীশু নিঃসন্দেহে মানব সন্তান ছিলেন । আর এজন্যই তাঁকে বারংবার "মানুষের পুত্র" বলা হয়েছে। আর মানুষের পুত্র

---

৩. *প্রথমত, 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটির বিপরীতে বাইবেলে বারংবার যীশুকে 'মনুষ্য পুত্র' বলা হয়েছে। এছাড়া তাকে বারংবার 'দাউদের পুত্র' বা 'দাউদ সন্তান' বলে আখ্যায়িত করার বিষয়ে নমুনা স্বরূপ পাঠক মথির সুসমাচারের নিম্নের শ্লোকগুলি* দেখতে পারেনঃ ৮/০, ৯/৬, ১৬/১৩, ১৭, ১৭/৯, ১২, ২২, ১৮/১১। আর যীশুকে দায়ূদের পুত্র বলার বিষয়ে পাঠক নমুনা হিসেবে নিম্নের শ্লোকগুলি দেখতে পারেন, মথি ১/১, ৯/২৭, ১২/২৩, ১৫/২২, ২০/৩০।

তো মানুষই হবেন, তিনি ঈশ্বর হতে পারেন না বা আক্ষরিক অর্থে ঈশ্বরের পুত্র হতে পারেন না।

দুই. 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটির মধ্যে 'পুত্র' শব্দটি কখনোই তার অভিধানিক অর্থে হতে পারে না। কারণ সকল জ্ঞানী একমত যে, অভিধানিক ও প্রকৃত অর্থে 'পুত্র' বুঝানো হয় পিতামাতা উভয়ের দৈহিক জৈবিক মিশ্রণের মাধ্যমে যার জন্ম। এ অর্থ 'ঈশ্বরের পুত্র' বোঝানোর ক্ষেত্রে কোনোভাবেই প্রযোজ্য হতে পারে না। কাজেই এক্ষেত্রে এমন একটি রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হবে যা খ্রিস্টের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যতাপূর্ণ হয়। আর ইঞ্জিল বা নতুন নিয়মের ব্যবহার থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটি যীশুর ক্ষেত্রে 'ধার্মিক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এর প্রমাণ, মার্কলিখিত সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোকে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে:"আর যে শতপতি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন যে, যীশু এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন কহিলেন, সত্যই এ মানুষটি (ইনি) ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।"

একই ঘটনায় উক্ত শতপতির উপর্যুক্ত বক্তব্য লূক তার সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে উদ্ধৃতি করেছেন। লূকের ভাষা: "যাহা ঘটিল, তাহা দেখিয়া শতপতি ঈশ্বরের গৌরব করিয়া কহিলেন, সত্য, এই ব্যক্তি ধার্মিক ছিলেন।"

এভাবে আমরা দেখেছি যে, মার্ক যেখানে 'ঈশ্বরের পুত্র' শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেখানে লূক 'ঈশ্বরের পুত্রের পরিবর্তে 'ধার্মিক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, যীশু ও যীশুর যুগের মানুষদের ভাষায় 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটির অর্থ ছিল "ধার্মিক মানুষ"।

(ঈশ্বর ব্যতীত কাউকে পিতা বলে সম্বোধন করিও না। আমি যার পুত্র,তোমরা তাঁর পুত্র।.....)

আমরা দেখেছি যে, যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণের জন্য খ্রিস্টান ধর্মগুরুগণ সুসমাচারগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছেন। যে কারণে সুসমাচারগুলির মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এগুলি নির্ভরযোগ্যতা হারিয়েছে। তারপরও খ্রিস্টানগণের দাবিমতে এগুলি বিশুদ্ধ এবং তাদের দাবিমতেই একথা প্রমাণিত হলো যে, সুসমাচারের পরিভাষায় 'ঈশ্বরের পুত্র' অর্থ ধার্মিক মানুষ। বিশেষত মার্ক ও লূক উভয়ের বর্ণনাতেই শতপতি যীশুকে মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন।

সুসমাচারগুলির বিভিন্ন স্থানে যীশু ছাড়া অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও "ঈশ্বরের পুত্র" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমনভাবে 'পাপীর' ক্ষেত্রে 'দিয়াবলের পুত্র' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

মথিলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ে রয়েছে: "৯ ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।....৪৪ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও; ৪৫ যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও.... ।"

এখানে যীশু যারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, মানুষদের মধ্যে মিল করেন এবং যারা শত্রুমিত্র সকলকেই ভালবাসেন তাদেরকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে অভিহিত করেছেন এবং 'ঈশ্বর'-কে তাদের পিতা বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও যোহনের ৪ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে বলা হয়েছেঃ যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বর হইতে জাত ও ঈশ্বরকে জানে।"

রোমীয় ৮ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে বলা হয়েছে: "কেননা যত লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলি সুস্পষ্টরূপে আমাদের দাবি প্রমাণ করে । এ সকল শ্লোকে যাদেরকে "ঈশ্বরের পুত্র" ও "ঈশ্বরের জাত" বলা হয়েছে তারা কেউই আক্ষরিক অর্থে "ঈশ্বরের জাত" বা "ঈশ্বরের পুত্র" নন; বরং উপরে উল্লিখিত রূপক অর্থে তাদেরকে "ঈশ্বরের পুত্র" বলা হয়েছে।

এছাড়া আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকগুলিতে 'পিতা' ও 'পুত্র' শব্দদয়কে অসংখ্য স্থানে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রদান করছি।

(১) লূক তার সুসমাচারের ৩ অধ্যায়ে খ্রিস্টের বংশাবলি বর্ণনা করতে যেয়ে ৩৮ শ্লোকে বলেছেন: "আদম ঈশ্বরের পুত্র।"

(২) যাত্রাপুস্তক ৪ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বর সদাপ্রভু মোশিকে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করেন: "আর তুমি ফরৌণকে কহিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত ২৩ আর

আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমার সেবা করণার্থে আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দেও; কিন্তু তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইলে; দেখ, আমি তোমার পুত্রকে, তোমার প্রথমজাতকে, বধ করিব।"

এখানে দুই স্থানে 'ইস্রায়েল'-কে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে, উপরন্তু তাকে প্রথমজাত পুত্র অর্থাৎ বড় ছেলে বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যিরমিয় ৩১:৯-এ ঈশ্বরের নিম্নোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে: "যেহেতু আমি ইস্রায়েলের পিতা-এবং ইব্রাহিম আমার প্রথমজাত পুত্র।"

২ শামূয়েল ৭ অধ্যায়ে শলোমনের বিষয়ে ঈশ্বরের নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে: "আমি তাহার পিতা হইবো, ও সে আমার পুত্র হইবে।"

যদি যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলায় তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়, তাহলে আদম, ইস্রায়েল, ইফ্রায়িম, দাউদ ও সুলাইমান ঈশ্বরত্বের বেশি অধিকারী বলে প্রমাণিত হয়; কারণ তাঁরা যীশুর পূর্বেই এ পদ লাভ করেছেন, তাঁরা তাঁর পূর্বপুরুষ এবং বিশেষত ইস্রায়েল, ইফ্রায়িম ও দায়ূদকে "ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র' বলা হয়েছে। আর আবরাহাম, মোশি ও অন্যান্য পূর্ববর্তী ভাববাদীদের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে প্রথমজাত পুত্রই সম্মান-মর্যাদার সর্বাধিক অধিকার ভোগ করেন। সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যেই এর প্রচলন রয়েছে।

বাইবেলের অনেক স্থানে সকল ইস্রায়েল-সন্তানকে "ঈশ্বরের পুত্র" বা "ঈশ্বরের সন্তান" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় বিবরণ ১৪/১, ৩২/১৯; যিশাইয় ১/২, ৩০/১, ৬৩/৮।

দ্বিতীয় প্রমাণ: যিশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে খ্রিস্টানগণের দ্বিতীয় যুক্তি- নতুন নিয়মের কিছু শ্লোকে যীশুকে এ জগতের নন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যোহন ৮/২৩: "তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা অধঃস্থানের, আমি উর্ধ্বস্থানের, তোমরা এ জগতের, আমি এ জগতের নহি।"

খ্রিস্টানগণ ধারণা করেন যে, এখানে যীশু তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রতি 'ইঙ্গিত' করেছেন এবং বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি পিতা ঈশ্বরের নিকট থেকে আগমন করেছেন এবং তিনি এ জগতের নন। তিনি মানুষরূপী হলেও মানুষ নন, বরং স্বর্গের বা উর্ধ্বজগতের ঈশ্বর।

তাদের এ ব্যাখ্যা মোটেও সঠিক নয়। কারণ, যীশু বাহ্যত ও প্রকৃত অর্থে এ জগতের ছিলেন। তাদের ব্যাখ্যাটি দুই কারণে বাতিল:

এক. এ ব্যাখ্যা যুক্তি, জ্ঞান ও বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক। তেমনি ভাবে তা নতুন ও পুরাতন নিয়মের অগণিত বাক্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

দুই. যীশু তাঁর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও এরূপ কথা বলেছেন। যোহনের সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে যীশু তার শিষ্যদেরকে বলেছেনঃ "তোমরা যদি জগতের হইতে, তবে জগত আপনার নিজস্ব বলিয়া ভালবাসিত; কিন্তু তোমরা তো জগতের নহ, বরং আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছি, এই জন্য জগত তোমাদিগকে দ্বেষ করে।"

এভাবে যীশু তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে বললেন যে, তাঁরা এ জগতের নন। উপরন্তু তিনি স্পষ্টভাবেই এ বিষয়ে তাদেরকে তাঁরই মতো একই পর্যায়ের বলে উল্লেখ করলেন। তিনি যেমন এ জগতের নন, তাঁর শিষ্যরাও ঠিক তেমনি এ জগতের নন। খ্রিস্টানদের দাবি অনুসারে, যদি এ জগতের না হওয়ার কারণে ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়, তবে যীশুর শিষ্যগণ সকলেই ঈশ্বর ছিলেন বলে প্রমাণিত হবে। মূলত এরূপ রূপক ব্যবহার সকল ভাষাতেই বিদ্যমান। ধার্মিক ও সংসারবিমুখ মানুষদেরকে সকল দেশে এবং সকল ভাষাতেই বলা হয় 'এরা এই জগতের মানুষ না।' তাই বলে কি আসলেই তিনি অন্য জগতের মানুষ হয়ে যান?

তৃতীয় প্রমাণ: যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে খ্রিস্টানদের তৃতীয় দলিল, যীশু নিজেকে ঈশ্বরের সাথে এক বলে উল্লেখ করেছেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে যীশুর নিম্নোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ "আমি ও পিতা, আমরা এক।"

খ্রিস্টানদের এই দাবি দুই কারণে বাতিল।

এক. প্রকৃত অর্থে যীশু খ্রিস্ট এবং ঈশ্বর কখনোই এক হতে পারেন না। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারেও তিনি ও ঈশ্বর এক ছিলেন না। কারণ, যীশু খ্রিস্টের একটি মানবীয় আত্মা ও দেহ ছিল। খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, এ দিক থেকে তিনি ঈশ্বর থেকে পৃথক ছিলেন। তারা বলেন যে, 'আমি ও পিতা এক' কথাটি বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা যাবে না বরং এর ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের মতে এর ব্যাখ্যা হলো, ঈশ্বরত্বের দিক থেকে যীশু ও ঈশ্বর

এক। মানুষ হিসেবে তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। আবার ঈশ্বরত্বের দিক থেকে তিনি পরিপূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন। তার মধ্যে দুটি পৃথক সত্তা বিদ্যমান ছিল। তার মধ্যকার পুত্র সত্তার দিক তিনি ও পিতা এক ছিলেন।

তাদের এ ব্যাখ্যা অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বর মাত্র। কারণ খ্রিস্টের বাক্য তার প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে অথবা যীশুর অন্যান্য বাক্য, অন্যান্য ঐশ্বরিক গ্রন্থের বাক্য এবং যুক্তি, বিবেক ও জ্ঞানের দাবির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের ব্যাখ্যাটি প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক; আবার জ্ঞান, যুক্তি এবং বাইবেলের অন্যান্য বাণীর সাথেও সাংঘর্ষিক।

দুই. এরূপ কথা যীশুর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ে রয়েছে, যীশু তাঁর শিষ্যদের বিষয়ে বলেন: "(২১) যেন তাহারা সকলে এক হয়, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যেন জগত বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। (২২) আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছো, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি; যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা এক। (২৩) আমি তাহাদের মধ্যে ও তুমি আমাতে, যেন তাহারা একের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে।"

এখানে যীশু বলেছেন: "যেন তাহারা সকলে এক হয়", "যেন তাহারা এক হয় যেমন আমরা এক" এবং "যেন তাহারা একের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে"। এ বাক্যগুলি থেকে বুঝা যায় যে, তারা সকলে এক ছিলেন। দ্বিতীয় বাক্যে যীশু উল্লেখ করেছেন যে- 'ঈশ্বরের সাথে তাঁর একত্ব' যেরূপ, 'তাদের মধ্যকার একত্ব'-ও ঠিক তদ্রূপ।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, যীশুর প্রেরিতগণ প্রকৃত অর্থে 'এক সত্তা' ছিলেন না, ঠিক তেমনি যীশুও প্রকৃত অর্থে 'ঈশ্বরের' সাথে 'এক সত্তা' ছিলেন না।

বস্তুত, 'ঈশ্বরের সাথে এক' হওয়ার অর্থ হলো- ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নির্দেশের সাথে নিজের ইচ্ছা ও কর্ম এক করে দেওয়া। তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা ও ধার্মিক জীবন যাপন করা। এই ঐক্যের মূল পর্যায়ে খ্রিস্ট, প্রেরিতগণ ও সকল বিশ্বাসী সমান।

এ সকল বক্তব্যে 'একত্ব', ঐক্য বা এক হওয়ার অর্থ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে নিজের ইচ্ছাকে এক করে দেওয়া, তার আনুগত্যে ও সেবায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া। 'একত্ব' অর্থ সকলের সত্তা এক হয়ে যাওয়া নয়। প্রেরিত ও শিষ্যগণের এক হওয়ার অর্থ তাদের সকলের সত্তা এক হওয়া নয়। অনুরূপভাবে যীশু ও ঈশ্বরের এক হওয়ার অর্থ উভয়ের সত্তা এক হওয়া নয়।

যুক্তি খণ্ডন

খ্রিস্টানগণ পানি, বরফ, বাষ্পে যে যুক্তি পেশ করলেন এটা একটি শিশুবুঝ দেওয়ার মতো। প্রিয় পাঠক! তাদের দাবিটি হল এমন যা ছোট্ট একটি শিশুও বুঝে কিন্তু খ্রিস্টানগণ যেন তা বুঝে না। যেমন ১+১+১=কত হয়? একজন ক্লাস ওয়ানের শিশুও বলবে ১+১+১ সমান সমান ৩ হয়। কিন্তু, খ্রিস্টানগণ বলেন ১+১+১ সমান সমান ১ হয়। পাঠক আপনারাই বুঝুন, খ্রিস্টানভাইদের বিশ্বাসের কি অবস্থা!

আমি অনেক খ্রিস্টান ফাদারের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এ পর্যন্ত কেউই আমাকে এর সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। শেষে বলেন, "এটা আপনি বুঝবেন না। আক্ষরিক জ্ঞান দ্বারা এটা বুঝা যায় না।"

ভাই, আমি কম বুঝি বলেই আপনাদের কাছে বুঝতে যাই। ইনশাআল্লাহ, ইসলাম সম্পর্কে হাজারো প্রশ্ন নিয়ে আমাদের কাছে আসবেন। অনুগ্রহ করে নিজেদের ধারণাকৃত মনগড়া ব্যাখ্যা নিয়ে/আপনারা ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা নিয়ে ঘরে বসে থাকবেন না। এতে আমরা ও আপনারা উভয়েই ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবো। কারণ,পৃথিবীর সকল জাতির সকল মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব প্রতিটি মুসলিমের। নিশ্চিত থাকুন, ইনশাআল্লাহ আমরা খুব খুশি হবো।

আলহাম্‌দুলিল্লাহ, ইসলামের আকিদাগুলো একজন নিরক্ষর মানুষও বুঝতে পারে। কারণ এটা সত্য; আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত।

আর, অন্যান্য ধর্মের বিশ্বাসগুলো অযৌক্তিক, কাল্পনিক। যার বিনিময়ে শুধুই নরক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক ধর্ম জানা ও মানার তৌফিক দান করুন। এপর্যায়ে আমি কুরআন থেকে কিছু প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করব দেখুন আল্লাহ তাআলা কী বলেন।

আল্লাহ ত্রিত্ববাদের অসারতা ও অযৌক্তিকতা বোঝানোর জন্য বলছেন: যদি নভোমন্ডলে ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ই ধ্বং হয়ে

যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।[০]

"আল্লাহর সাথে (অন্য) কোনো মবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র ।"[০]

নভমন্ডল ও ভুমন্ডলে যদি দুই বা ততোধিক খোদা থাকত, স্বভাব-ই উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ হত। একজন বলত, আমি পূর্বদিক হতে সূর্য উদিত করব, অন্যজন বলত পশ্চিম দিক হতে। এক খোদা হয়তো চাইত, এখন শীতকাল হোক, অন্য খোদা বলত, এখন গ্রীষ্মকাল। এমতাবস্থায়, উভয়েই ঝগড়া-বিবাদ করে নিজ নিজ সৃষ্টি সরিয়ে নিত। ফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্বের সবই ধ্বংস হয়ে যেত।

দ্বিতীয়তঃ যদি ঝগড়া করে একজন পরাভুত হয়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে না। সর্বভৌম ক্ষমতা যার নেই, সে তো খোদা হতে পারে না।

তৃতীয়তঃ যদি উভয় কোদা পরস্পর পরামর্শ করে কাজ করে এবং একজ অপরজনের পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করাতে না পারে তবে প্রমাণ হয় যে, তাদের কেউ-ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। বলাই বাহুল্য স্বয়ং সম্পূর্ণ না হলে সে সর্বশক্তিমান হয় কীভাবে?

অতএব, একের অধিক খোদা হওয়ার দাবি অযৌক্তি। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান। তিনি কারো অধীন নন। তার কোনো কাজে জিজ্ঞাসা করার কারো কোনো ক্ষমতা নেই। কিন্তু কে গ্রহ্য করে? হায়রে অন্ধ বিশ্বাস ঈসা মূসা এবং কুরআননের নিষেধ সত্তেও মুক্ত বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কি করে এমন ত্রিত্ববাদ মেনে চলে যা উদ্ভট ও অযৌক্তি?

ঈশ্বর সম্পর্কে বাইবেলে স্ববিরোধী বিবরণ

১. বাইবেলে বলা হয়েছে ইশ্বর একজন। দেখুন

[০] সুরা আম্বিয়া- ২২

[০] সুরা মুমিনুন-৯১

১. দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৫
২. মার্ক: ১২:২৯-৩০,৩২
৩. মথি: ২২: ৩৬-৩৮
৪. যাকোব: ২:২

২. বইবেল তিন ঈশ্বর

বাইবেলে কথাও সরাসরি একথা নেই ঈশ্বর তিন জন। বরং তারা ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলে ঈশ্বর তিন জন। এমনকি বাইবেলে কথাও লেখা নেই যে, ঈসা আ. বলেছেন আমি ঈশ্বর । বা আমাকে তোমরা ঈর মানো। এর পরও ঘুরিয়ে পেচিয়ে যে সব ব্যাখ্যা দেয় তাও উল্যেখ করলাম। দেখুন

১. মথি - ২৮:১৯
২. যোহন- ১৪:১১
৩. মথি-৩:১৬

এগুলোও আবার সবিরোধ। এসব আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম খ্রিস্টান ভায়েরা যে দাবি করল, তার কোনো কনো দলিল তাকে নেই। আর যা আছে তাও অগ্রহণ যোগ্য। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করুন।

তিন দিন পর তিনি পুনরায় জীবিত হলেন

খ্রিস্টানদের দাবিঃ ঈসা আ. মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তাকে কবর দেওয়া হলো; কিন্তু তিনদিন পর তিনি পুনরায় জীবিত হলেন। এর পর ৪০ দিন পৃথিবীতে থাকলেন।

তাদের দলিলঃ

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

অর্থঃ আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে ঈসা, আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো- কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দিবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা কাফের তাদের ওপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুত তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দিবো।°

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা:

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মাতরুল ওয়ারাক র. বলেন এর ভাবার্থ হচ্ছে- 'আমি তোমাকে দুনিয়া হতে উত্তোলনকারী।' এখানে وفات শব্দের ভাবার্থ মৃত্যু নয়। অনুরুপভাবে ইবনে জারির র. বলেন যে, এখানে تَوَفِّي শব্দের অর্থ হচ্ছে উঠিয়ে নেয়া। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে এখানে وفات শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে নিদ্রা। যেমন কুরআন হাকীমের অন্য জায়গায় রয়েছে هوالذى يتوفكم بالليل অর্থ তিনি সেই আল্লাহ যিনি রাতত্রে তোমাদেরকে নিদ্রা দিয়ে থাকেন ।°

°. আলইমরান-৫৫

° আনআম-:৬০

আরো এক স্থানে রয়েছে: অর্থ আল্লাহ প্রাণকে তার মৃত্যুর সময় উটিয়ে নেন এবং যে প্রাণ মরে যায় না তাকে তার নিদ্রার সময় (উঠিয়ে নেন)° রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে বলতেন। অর্থ সেই আল্লাহর সমুদয় প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদান করার পর পুনরায় জীবিত করলেন। আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় বলেন তাদের অবিশ্বাসের কারণে এবং হযরত মারয়াম আ. এর উপর বড় অপবাদ দেয়ার ফলে এবং এই কারণে যে, তারা বলে- আমরা মারয়িাম তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি, অথচ তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলেও দেয়নি বরং তারা সন্দিহান হয়েছে।

যেভাবে অপব্যাখ্যা করেঃ

"আমরা জানি, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু আসে এবং লাশ মাটিতে কবর দেওয়া হয় বা পুড়িয়ে ফেলা হয়। আমরা যদি হযরত ঈসা মসিহের জীবনের দিকে লক্ষ করি তাহা হইলে দেখিব যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁহাকে কবর দেওয়াও হইল কিন্তু ৩দিন পরে তিনি পুনরায় জীবিত হইলেন এবং ৪০ দিন এই পৃথিবীতে থাকিলেন তারপর তাহাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট তুলিয়া নেওয়া হইলো। হযরত ঈসাকে তুলিয়া নেয়া হইল তাহা নয়, এমনকি তাহার অনুসরণকারীদের কিয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের ওপর 'বিজয়ী' করিয়া রাখা হইবে বলিয়া আল্লাহ তা'আলা উপর্যুক্ত আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন। °

উত্তরঃ প্রথমতঃ আয়াত এক বিষয়ের, আর খ্রিস্টানগণ অপব্যাখ্যা করে অন্য বিষয়ের আলোচনা করেছে। এটাই তাদের চিরচরিত স্বভাব। খ্রিস্টানভাইদের প্রতি আমার প্রশ্ন আপনারা যে বলেন, "ঈসা আ. মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তাকে কবর দেওয়া হইলো। কিন্তু ৩দিন পর তিনি পুনরায় জীবিত হইলেন এবং ৪০ দিন এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিলেন, তারপর তাহাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট তুলিয়া লওয়া হইল।" -এই কথাগুলো কুরআনের কোন্ স্থানে পাইলেন ? কোরআনের কোথাও দেখাতে পারবেন

°. -৩৯আয যুমার:৪৩

° তরিকুল জান্নাত পৃঃ ২৭

না। উপর্যুক্ত ব্যাখ্যাটি কোন তাফসীর গ্রন্থে পেলেন? কোনো তাফসীর গ্রন্থে পাবেন না। যদি না পান তাহলে আপনাদের মনগড়া ব্যাখ্যা মানব কেন? আপনাদের এই ব্যাখ্যার সাথে আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। আপনাদের কাছে অনুরোধ করি, এভাবে মনগড়া ব্যাখ্যা করে নিজে জাহান্নামের খড়ি হবেন না এবং সহজ সরল মুসলমানদেরকেও জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবেন না। এর চেয়ে বরং ইসলাম গ্রহণ করে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করুন। পড়ুন এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করুন- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ "যারা ঈসা আ.-এর অনুসরণ করবে, তারা কেয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের উপর বিজয়ী থাকবে" এই ব্যাখ্যা খ্রিস্টানগণ করেছেন।

এবার আমার প্রশ্ন, কাফের কারা? এবার শুনুন কুরআন কাদেরকে কাফের বলেছে।

সূরা মায়েদার ৭২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলাপাক বলেন-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থঃ তারা কাফের, যারা বলে যে মরিয়ম-তনয় মসিহ্-ই আল্লাহ তা'আলা; অথচ মসিহ্ বলেন, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

আমরা দেখছি- খ্রিস্টানগণ ঈসা আ.-কে আল্লাহ বলেন। বুঝা গেল, কুরআনের ভাষায় কাফের হল খ্রিস্টানগণ। আর এই কাফেরের উপর ঈসার অনুসারীদেরকে বিজয় দান করবেন। প্রকৃতপক্ষে, ঈসার অনুসারী কারা? ঈসার অনুসারী হলেন মুসলমানরা; খ্রিস্টানরা নয়। মুসলমান হলেই ঈসার প্রকৃত অনুসারী হওয়া যাবে। পৌলের অনুসরণ করে খ্রিস্টান হয়ে ঈসার অনুসারী ভাবলে নিতান্তই ভুল হবে। মনে মনে মনকলা খাওয়ার মতই হবে।

বর্তমান খ্রিস্টানগণ কার অনুসরণ করে? ঈসার? না পৌলের? না শয়তানের? নিম্নের একটি চার্ট দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

কুরআন অনুযায়ী ঈসার অনুসারী কে?

কুরআন	খ্রিস্টান
১.কুরআন বলে ঈসা আল্লাহ তা'আলারবান্দা।[১]	১. খ্রিস্টানগণ বলেন, ঈসা আ.নিজেই আল্লাহ তা'আলা।[৪]
২.কুরআন বলে, ঈসা রাসূল ছিলেন।[২]	২. খ্রিস্টানগণ বলেন, ঈসা আ. আল্লাহ তা'আলার ছেলে ছিলেন।
৩.কুরআন বলে, আল্লাহ তা'আলা কে ছাড়া আর কারো উপাসনা করা যাবে না।[৩]	৩. খ্রিস্টানগণ বলেন, তিন খোদার উপাসনা করতে হবে।
৪.কুরআন বলে ঈসা আ. শুধু বনী ইস্রায়েলের জন্য আদর্শ।[৩]	৪. খ্রিস্টানগণ বলেন, ঈসা আ. সকল জাতির জন্য।[৫]
৫. কুরআনে ঈসা আ. বলেন আল্লাহ তা'আলাই আমার প্রতিপালক; তোমরা তারই ইবাদত কর।[৩]	৫. খ্রিস্টানগণ বলেন, তিনজন প্রতিপালক; তাদেরই ইবাদত কর।
৬ কুরআন বলে, ঈসা আ.আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে পাখির মধ্যে রুহ ফুঁক দিতেন এবং মৃত মানুষকে তাঁরই নির্দেশে জীবিত করতেন।[৩]	৬. খ্রিস্টানগণ বলেন, তিনি নিজের ক্ষমতায় ফুঁ দিয়ে পাখি বানাতেন ও মানুষ জিন্দা করতেন।(মনগড়া যুক্তি)
৭. কুরআন বলে, ঈসা আ.-কে শুলিতে চড়ানো হয়নি।[৩]	৭. খ্রিস্টানগণ বলেন, ঈসা আ.-কে শুলিতে চরানো হয়েছে(ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছে)।[৬] ৮. খ্রিস্টানরা বলে, বলে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন পরে কবর দেয়া হয়েছে, তিনদিন পর আবার জীবিত হয়েছেন।[৩]
৮. কুরআন বলে, ঈসা আ.-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।[৩]	০৯. খ্রিস্টানরা বলে, তিন খোদার উপাসনা কর।
৯.কুরআন বলে এক আল্লাহ তা'আলার উপাসনা কর।[৩]	১০. খ্রিস্টানরা বলে, ঈসা আ. আল্লাহ তা'আলা /প্রভু ছিলেন।
১০. কুরআন বলে ঈসা আ. নবী ছিলেন।[৩]	

[১]. সূরা ঈসাঃ ১৭২-১৭৫
[২]. সূরা মায়েদাঃ ৭৫
[৩]. সূরা মায়েদাঃ ১১৬-১২০
[৪]. সূরা আয যুখরুফঃ ৫৯-৬৩
[৫]. সূরা আয যুখরুফঃ ৬৪-৬৭
[৬]. সূরা মায়েদা ঃ ১১০

যীশু খ্রিস্টানদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য প্রাণ দিয়েছেন

দাবি: খ্রিস্টানদের দাবি হলো, ঈসা আ. শুলিতে চরে সকলের পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

তাদের দলিল

[১]. যোহন:-৫:১৬-২৩

[২]. মথি:-২৮:১৯

[৩]. যহন :৫ ১৫-২৩, মার্ক :-১৫:৩৯
[৪]. সূরা ঈসাঃ ১৫৭-১৫৮
[৫]. সূরা ইমরানঃ ৫৫
[৬]. সূরা মায়েদাঃ৭২-৭৪
[৭]. সূরা মায়েদাঃ ৭৫
[৮]. তরিকুল জান্নাত-পৃঃ ২৮

প্রমাণ সরুপ বাইবেল থেকে একটি উক্তি পেশ করে, তা হলো, **"যীশু ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণ দিয়ে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন।"**[০] । আপনি কি এ ঘটনা বিশ্বাস করেন?

উত্তর:

খ্রিস্টানরা যেই দাবি করে তার মধ্যে কয়েকটি বিষয়, ১. ক্রুশকাষ্ঠে যীশুর মৃত্যু । ২. যীশুর কবর । এসব বিষয় নিয়ে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে সবিরোধে ভর পুর। তার মধ্য হতে কিছু পাঠকদের সমিপে পেশ করলাম।

ক্রুশকাষ্ঠে যীশুর মৃত্যু হয়েছিল কটার সময় ?

১) মথি (২৭:৪৬) লিখেছেন, ইংরেজী বাইবেলে নয়টার সময়, মিথ্যা বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে 'তিনটার সময়';
২) মার্ক (১৫:২৫) লিখেছেন, তিনটার সময়,;
৩) লুক (২৩:৪৪) লিখেছেন, ইংরেজী বাইবেলে ছয়টার সময়, মিথ্যা বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে 'তিনটার সময়,
৪) যোহন'(১৯:১৪) লিখেছেন, ইংরেজী বাইবেলে ছয়টার সময়, মিথ্যা বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে 'বেলা দুপুরে'।

যীশুর কবর দেখতে গিয়ে কে কোথায় বসেছিলেন?

মথি (২৮:২) লিখেছেন, **একজন ফেরেশতা বাইরে পাথরখানার উপর বসেছিলেন।**

মার্ক (১৬:৫) লিখেছেন, **একজন যুবক কবরের ভিতরে ডান দিকে বসেছিল।**

লুক (২৪:৪)লিখেছেন, **দুইজন লোক কবরের ভিতরে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।**

যোহন (২০:১২) লিখেছেন, **দুইজন ফেরেশতা ভিতরে বসে আছেন- একজন মাথার দিকে, অন্যজন পায়ের দিকে।**

খ্রিস্টানদের প্রভূ ও ত্রাণকর্ত্তা তাঁর নবুয়তের শেষ সময়ে এসে গাধায় আরোহন করে যেরুজালেমে গিয়েছিলেন (মথি ২১:৭), মার্ক (১১:৭), লুক (১৯:৩৫) এবং যোহন (১২:১৪)। কে গ্রহ্য করে? এ ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছুই নয়। অথচ এ বিষয়ে প্রামাণিক (Canonical) সুসমাচারের লেখকগণ সকলেই একমত। সকলেই তাদের নিজ নিজ ইঞ্জিলে এ ঘটনাটি লিখে গেছেন। যদি ইঞ্জিলের লেখকগণ অহী প্রাপ্ত হয়ে তাদের ইঞ্জিল লিখে থাকতেন, তবে অন্য তিনজন লেখক ভূমিকম্প হওয়া এবং আসমান থেকে ফেরেশতা অবতরণ করা -এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখতে ব্যর্থ হলেন কি ভাবে? মোটের উপর 'ক্রুশারোহনে যীশুর মৃত্যু' এবং 'পুনরুত্থান' এ প্রাসঙ্গিক পুরা ঘটনাবলী অস্পষ্ট ও অবিশ্বাস্য। এমনকি অনেক খ্রিস্টান পন্ডিত 'ক্রুশারোহনে যীশুর মৃত্যু' এবং তাঁর 'পুনরুত্থান' সম্বন্ধে সন্ধিহান।

আল্লাহ তাআলা বলছেন: **তারা না ঈসা আ. কে হত্যা করেছে, আর না তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে,বরং তারা এরূপ ধাঁধাঁয় পতিত হয়েছিল (এক লোককে তাঁর সদৃশ করা হয়েছিল)। আর যারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছিল তারা এ সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে আছে। শুধু অমূলক ধারনার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। এটা নিশ্চিত সত্য যে,তারা তাঁকে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়** (কুর'আন ৪:১৫৭-১৫৮)।

যীশুর প্রত্যাক্ষদর্শী সাহাবা হযরত বার্ণবা তাঁর লিখিত ইঞ্জিলে লিখে গেছেন, "জুদাস ইসকারিয়েৎ ছিল যীশুর দ্বাদশ শিষ্যের মধ্য থেকে একজন। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল। জুদাস যখন রোমীয় সৈন্যদের নিয়ে যীশুর অবস্থানের নিকটবর্তী হল, যীশু অনেক লোকের আগমন বুঝতে পারলেন, তিনি ভয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করে একটি ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। অবশিষ্ট এগারজন শিষ্য ঘুমাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার বিপদ দেখে জিব্রাঈল, মিখাইল, ঈস্রাফিল ও আজ্রাঈল -এ চারজন ফেরেশতাকে যীশুকে পৃথিবী থেকে তুলে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। পবিত্র ফেরেশতাগণ ঈসা আ.কে তুলে নিলেন, তৃতীয় আসমানে তাঁকে পৌঁছে দিলেন। সতসত গুণকীর্তনকারী ফেরেশতাদের সহচর্যে তিনি অবস্থান করছেন। যীশুকে যে স্থান থেকে তুলে নেয়া হয়েছিল জুদাস সকলের পূর্বে দ্রুত সেখানে প্রবেশ করল। 'শ্রেষ্ঠ কৌশলী আল্লাহ

[০] (ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৫:৮, ১২-১৯)

তাআলঅ বিস্ময়কর কাজ করলেন: জুদাস কথায়, আকার ও আকৃতিতে এমনভাবে অবিকল যীশুর মত পরিবর্তিত হয়ে গেল যে, আমরা তাকে যীশুই মনে করলাম'।

কুর'আনেও একই রূপ বলা হয়েছে: **তারা চক্রান্ত করেছে, আর আল্লাহর কৌশল অবলম্বন করলেন। বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কৌশলী** (কুর'আন৩:৫৪)।

রোমীয় সৈন্যরা জুদাসকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল এবং তাকে ক্যালভারি পর্বতে ন্যাংটা করে ক্রুশারোহনে হত্যা করল। দাউদ আ. ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এই বলে যে, **'ঐ ব্যক্তি নিজেই সে গর্তে পতিত হবে অন্যকে ফেলার জন্য যে তা খনন করেছিল'** (আরো দেখুন প্রেরিত১:১৬)।

বার্ণবা আরো লিখেছেন: যারা আল্লাহকে ভয় করে না ঐ সাহাবাগণ রাত্রিতে জুদাসের শবদেহ চুরি করে নিয়ে গেল এবং লুকিয়ে রেখে এক খবর প্রচার করে দিল যে, কবর থেকে যীশুর পুনরুত্থান হয়েছে। এতে বিরাট বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হল। (হযরত বার্ণবা লিখিত ইঞ্জিল, অধ্যায় নং ২১৪ থেকে ২২১ দ্রষ্টব্য)। পৌল বলেছেন: **খ্রিস্ট যদি উত্থাপিত না হয়ে থাকেন, তবে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা** (১ করিন্থীয় ১৫:১৪)।

এক নজরে ক্রুশকাষ্ঠে যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে স্ববিরোধী বিবরণ

কে এবং কী?	মথি	মার্ক	লুক	যাহন
কে যীশুকে বন্ধি করেছিল?	২৭:২৭ রোমীয় সৈন্যেরা	১৪:৪৩ অনেক লোক	২২:৪৭ অনেক লোক	১৮:১২ রোমীয় সৈন্যেরা
যীশুকে কী পরিয়েছিল?	২৭:২৮, লাল রংএর জুব্বা	১৫ঃ১৭, বেগুনী রংএর কাপড়	কিছুই বলা হয়নি	১৯ঃ২,বেগুনী রংএর কাপড়
ক্রুশকাষ্ঠে কখন যীশুর মৃত্যু হয়েছিল?	২৭:৪৬,তিনটার সময়, ইংরেজী বাইবেলে নয়টার সময়	১৫:২৫,তিনটার সময়,	২৩:৪৪, তিনটার সময়, ইংরেজী	১৯:১৪,বেলা দুপুর, ইংরেজী বাইবেলে
			বাইবেলে ছয়টার সময়	ছয়টার সময়
যীশুর শেষ কথা কী ছিল?	২৭:৪৬, খোদা আমার (দুইবার), কেন তুমি আমাকে ছেড়ে গিয়েছ	১৫:৩৪, খোদা আমার (দুইবার), কেনতুমি আমাকে ছেড়ে গিয়েছ	২৩:৪৬, পিতা, তোমার হাতে আমার রূহ তুলে দিলাম	১৯:৩০ শেষ হয়েছে
কে সমাধিতে গিয়েছিলেন?	২৮:১ মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম	১৬:১, মগ্দলীনী মরিয়ম ও শালোমী	২৩:৫৫ গালীল থেকে আসা স্ত্রীলোক	২০:১৫ মরিয়ম
সমাধিতে কেন গিয়েছিলেন?	২৮:১ কবরটা দেখতে	১৬:১, সুগন্ধি মলম মাখাতে	২৩:৫৫, কবরটা দেখতে	অকারণে
কোন ভূমিকম্প হয়েছিল কি?	২৮:২,তখন হঠাৎ ভূমিকম্প হয়েছিল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
কোন ফেরেশতা এসেছিল কি?	২৮:১, ফেরেশতা অবতরণ করেছিল	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
কে পাথরখানা সরিয়েছিল?	২৮:২, ফেরেশতা পাথরখানা সরাইল?	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
কবরের ভিতরে না, বাইরে? কে কোথায় বসেছিল ?	২৮:২,একজন ফেরেশতা বাইরে পাথরের উপর বসেছিল	১৬:৫, একজন যুবক কবরের ভিতরে বসেছিল	২৪:৪, দুইজন লোক তাদের পাশে	২০:১২, দুই ফেরেশতা ভিতরে, এক মাথার দিকে, এক

			এসে দাঁড়াল	পায়ের দিকে
পুনরুত্থানের পর কাকে কখন প্রথম দেখা দিলেন	২৮:৬, যীশু দইজন স্ত্রীলোককে দেখা দিলেন	১৬:৯, যীশু মগ্দলীনী মরিয়মকে দেখা দিলেন	২৪:১৫, ইম্মায়ূ গ্রামে দুইজন সাহাবীকে দেখা দিলেন	২০:১৪, যীশু মগ্দলীনী মরিয়মকে দেখা দিলেন

প্রিয় পাঠক ! আপনারা বুঝতে পারলেন খ্রিস্টানদের বাটপারি তাদের ধর্মীয় নেতারা যে ব্যাপারে সন্দিহান সে বিষয় নিয়ে তারা দলিল পেশ করে, এবং সাধারণ মুসলমাদের ঈমান ধ্বংশকরে। আল্লাহ তাআলা তাদের চক্রান্ত থেকে মুসলমানদের হেফাজত করুন। আমিন।

মুরতাদ ভাইদের প্রতি আকুল আবেদন

প্রিয় ভাইটি আমার! আমি আপনার খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনাকে খুব ভালোবাসি। আপনার প্রতি আমার খুব দয়া হয়, মায়া হয়। আপনার জন্য আমি সর্বদাই দু'আ করি। আপনার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে যাই। অস্থির হয়ে যাই। মাঝে মাঝে আমার ঘুম চলে যায়। কারণ আপনি না বুঝার কারণে, বা ভুল বুঝে শান্তির ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে চিরস্থায়ী জাহান্নামে ঝাঁপ দিচ্ছেন। চলছেন চিরস্থায়ী অন্ধকার ও জাহান্নামের পথে। মুসলমান কখনো খ্রিস্টান হতে পারে না। আপনার ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে, খ্রিস্টানদের লেখা কিছু বই পড়ে বা অপব্যাখ্যা শুনে ইসলাম ছেড়েছেন। তারা কুরআনের অপব্যাখ্যা করে আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছে তাই শিখেছেন। আপনি কিন্তু পুরো কুরআন অর্থসহ বুঝে পড়েন নি। পড়েছেন শুধু তারা যেই আয়াতগুলো আপনাকে শিখিয়েছে। এর উপরই আপনি অবিচল আছেন। এগুলো শিখেছেন সেই খ্রিস্টানদের কাছেই; কোনো বিজ্ঞ আলেমের কাছে যান নি। সে সম্পর্কে তাদের থেকে শিখেন নি। আপনাকে তারা যেই কিতাবের দাওয়াত দিয়েছে, বর্তমান ইঞ্জিল-তাওরাত-কিতাবুল মুকাদ্দাস এগুলোর স্বরূপ ইতোমধ্যে আপনার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এগুলোর মিথ্যার স্বরূপ আপনি গভীর ভাবে পড়ুন, বুঝুন এবং আমল করার চেষ্টা করুন।

প্রিয় ভাইটি আমার! অনেকে আবার খ্রিস্টান হয়েছেন অভাবের জন্য। ভাই! কিছু টাকা-অর্থ সম্পদের জন্য আপনার জীবনের মহামূল্যবান সম্পদ ঈমান ছেড়ে দিলেন? ইসলাম ত্যাগ করলেন! চিরস্থায়ী জাহান্নামের ইন্ধন হয়ে গেলেন? ভাই! টাকা-পয়সা অনেকেই উপার্জন করে। এসব তো হাতের ময়লায় ভরা কাগজের টুকরা। এই সামান্য বিনিময়ে নিজে জাহান্নামের টুকরা হতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন? ভাই আমার! যে ঈমান অর্জন অথবা উপার্জন করে, তার মতো উপার্জনকারী আর কেউ কি হতে পারে?

প্রিয় ভাইটি আমার!! দুনিয়া ও এর মাঝের সব কিছুই আজ আছে তো কাল নেই। একদিন কিছুই থাকবে না। এর মধ্যে শান্তি নেই। আপনি ধনী হতে পারেন, কিন্তু মন থেকে আপনি শান্তিতে নেই। কারণ, আপনি যেই পথে আছেন সেটা শান্তির পথ নয়।

ভাই আমার! আমি আপনার হাতে ধরি, পায়ে ধরি, আপনি ফিরে আসুন। জাহান্নামের পথ ত্যাগ করুন। আপনি মুসলমান হয়ে যান, আমি চাই না আপনি চিরস্থায়ী জাহান্নামে জ্বলুন। আমি চাই না আপনি কঠিন শাস্তি ভোগ

করুন। দেখুন ভাই এই দুনিয়ার আগুনে সামান্য সময় আঙ্গুল দিয়ে রাখতে পারি না। প্রখর রৌদ্রে সূর্যের তাপ সহ্য করতে পারি না। তাহলে চিরকাল যেই আগুনে থাকতে হবে তা কীভাবে সহ্য করব। ভাই, আমি আপনাকে এই কথাগুলো বলছি, এর বিনিময়ে আপনি কিন্তু আমাকে টাকা-পয়সা কিছুই দিবেন না। শুধু আপনাকে ভালবাসি বলেই এ কথাগুলো বলছি।

আবারও বলছি, ভাই আপনি মুসলমান হয়ে যান। আপনি ফিরে আসুন শান্তির পথে, ফিরে আসুন সত্যের পথে। আপনার বিস্তারিত কিছু জানার থাকলে আমার সাথে যোগাযোগ করুন। বিতর্ক নয় সত্য জানার যদি আপনার আগ্রহ থাকে, আপনি যদি আরো কিছু জানতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই সময় দিবো ইনশাল্লাহ তা'আলা। আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দিব ইন্‌শাআল্লাহ তা'আলা।

ভাইটি আমার! শেষ বারের মতো অনুরোধ করছি, আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করুন, হে আল্লাহ তা'আলা ! আপনি আমাকে সঠিক পথ দেখান। হে আল্লাহ তা'আলা ! আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন না। হে আল্লাহ তা'আলা ! আমাকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন!!

ভাই! আপনার ইসলামে ফিরে আসার সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমার অস্থির মন শান্তি হবে না। আপনি মুসলমান হয়ে আপনার এই হৃদয়বান ভাইটিকে শান্ত করুন। সুসংবাদটি জানিয়ে ভাইটিকে স্থির করুন।

ইতি
আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী ভাই
যুবায়ের আহমদ
১৪/১২/৩৫ হিঃ
১০/১০/১৪ ইঃ

গ্রন্থ পঞ্জী

১. আল কুরআনুল কারীম।
২. তাফসীরে ইবনে কসীর।
৩. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন।
৪. তাফসীরে আশ্রাফিয়া।
৫. তাফসীরে সাফওয়াতুল মাসাদির।
৬. তাফসীরে কুরতুবী।
৭. তাফসীরে মারেফুল কুরআন।
৮. তাফসীরে মাজাহেরী।
৯. তাফসীরে বাগবী ।
১০.তাফসীরে আবুস সাউদ।
১১.কাসাসুল কুরআন।
১২.মাজমাউয যাওয়ায়েদ।
১৩. বুখারী শরীফ
১৪.ফাতহুল বারী।
১৫. মানাহিরুল ইরফান।
১৬. যাদুল মাআদ।
১৭.সীরাতে ইবনে হিশাম।
১৮. আল ইত্‌কান।
১৯. আলবুরহান ফি উলুমিল কুরআন।
২০. মুস্তাদরাক।
২১.ইবনে জারির
২২. রুহুল মাআনী।

২৩. গুনাহগারদের জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ।
২৪. বাইবেল।
২৫. যুবুলী বাইবেল
২৬. ইঞ্জিল।
২৭. তাফসিরুল ইঞ্জিল।
২৮. সত্যের সন্ধানে।